নীল বিদ্রোহের জার্মান পুরোহিত

পরিতোষ মজুমদার

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট। কলিকাতা—৭৩

॥ উৎসর্গ ॥

শ্রীবি, কে, দত্ত

—শ্রদ্ধাভাজনেষু

You must either conquer and rule,
or Serve and lose. suffer or triumph,
be the anvil or the hammer.

Johann Wolfgang Van Goethe,

॥ এক ॥

কেষ্টগঞ্জের ঘাট পেরিয়ে রাস্তাটা চৌগাছা, ডাকাতে গাড়ীর মাঠ, ভীমপুর, আসাননগর ইত্যাদি গ্রামগুলোকে বুড়ি ছুঁয়ে সোজা একেবারে সদর শহর কৃষ্ণনগরে চলে গেছে।

হাট ভাঙতে ভাঙতে বেশ দেরী হয়ে যায়। মেঘাই মনে মনে তেতে ওঠে গণপতি আর নটবরের ওপর। সারাটা সপ্তাহ তাকিয়ে থাকে এই হাটের দিকে। নতুন পাট উঠেছে। তাই দরদাম বুঝেসুঝে নিয়ে পাট ছাড়তে ছাড়তে হাট প্রায় ভেঙ্গে গেছে। নটবর আর গণপতিকে মেঘাই একটু অপেক্ষা করতে বলেছিলো। ওরা করে নি। যে দাম পেয়েছে তাতেই মাল ছেড়ে দিয়ে কাঁচা পয়সা হাতে নিয়ে কেষ্টনগরে গেছে ফুর্তি-ফার্তা করতে। কিন্তু চোত্ বোশেখের আকাশ জ্বলা রোদ্দুর আর ভরা ভাদরের অঝোর কান্না মাথায় নিয়ে যে পাট বুনেছে, তার লাভের শেষ কড়িটা পর্যন্ত আদায় না করে মেঘাই হাট ছাড়তে পারেনি। গণপতিদের কথা ভেবে হাসি পায়, দুঃখও হয়। নতুন পাট যেন ওদের চোখে নতুন পয়সার স্বপ্ন এঁকে দিয়েছে। যে কোন দামে ছেড়ে দিয়ে কেষ্টনগরে কদমতলীর ঘাটের মেয়েমানুষগুলোর কাছে গেছে মজা লুটতে। কাপড়ের খুঁটের সব পয়সা খুইয়ে আবার ক'দিন বাদেই মহাজনের গদীতে ছুটবে দাদন নিতে।

ঘরে বউ সেজেগুজে অপেক্ষা করবে ওদের ফেরার আশায়। হাটে আসার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই হয়তো আবদার ধরেছে টুকিটাকি সখের জিনিসের জন্য। শহরের আল্তা অথবা গাছাকতক রঙিন কাঁচের চুড়ি। আর লাভ বেশী হলে বড়ো জোর রঙিন একটা তাঁতের শাড়ী। ঘরে বউ রেখে কদমতলীর ঘাটের মেয়েমানুষগুলোর কাছে যাওয়াতে ওদের ওপর রাগটা যেন আরো বেশি হয় মেঘাইয়ের। হোক্ না বন্ধু; মেঘাইয়েরও উঠতি বয়েস। ওর রক্তেও তো মেয়ে-

মানুষকে বুকে চেপে ধরার আকাংখা ঢেউ তোলে। তবু ঘরে বউ রেখে নষ্ট মেয়েমানুষগুলোর কাছে যাওয়াটা যেন ও কল্পনাতেও আনতে পারে না। না হয় শহরের মেয়েগুলো ঘরের বউ-ঝিদের চেয়ে একটু বেশী-ই রঙ্গ জানে, ফষ্টিনষ্টি করতে পারে ; তাই বলে ঘরের লক্ষীকে ফেলে রেখে বাইরের মেয়েদের কাছে গৃহস্থঘরের ছেলেদের যাওয়া উচিত ? ভাবতেও শরীরের শিরায় শিরায় একটা ঘৃণা পাক খেয়ে যায়। কোষে কোষে আগুন জ্বলে।

রাত দু'প্রহর পার করে এতো মেহনতীর সমস্ত পয়সা খড়ের জলে ঢেলে দিয়ে তবে বাড়ী ফিরবে। ততোক্ষণে দাওয়ায় সুপারী গাছগুলোর পাশ দিয়ে এগিয়ে এসে রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বউগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়বে। ওরা যখন বেহুঁস হয়ে ঘরে ফিরবে, তখন মুখে রঙ-মাখা মেয়েমানুষগুলোর কাছে যাবার জন্য শাপশাপান্ত কান্নাকাটি করবে ; তারপর ঘরে তুলে নিয়ে সেই স্বামীকেই জড়িয়ে ধরে বাকী রাতটা অঘোরে কাটিয়ে দেবে।

মেঘাই তাকিয়ে দেখে হাট প্রায় ভেঙ্গে এসেছে। ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয় পক্ষই হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দিয়ে যে যার নিজেদের গ্রামের দিকে পা বাড়াতে ব্যস্ত। মেঘাইয়ের মনে পড়ে, মা আসবার সময়ে বারবার শিবনিবাসের মন্দিরটা ঘুরে যেতে বলেছিলো। নতুন ওঠা পাটের পয়সায় পূজোটা আজকে দিয়ে যাওয়াই ভালো। অবশ্য পূজো দিতে দিতে সন্ধ্যে পার হয়ে যাবে। তবে আজ প্রথম প্রহরেই চাঁদ উঠবে। অন্ধকার হওয়ার ভয় নেই। সেই চাঁদের আলোয় সোজা সড়ক ধরে এগিয়ে গেলেই হলো। মাঝে দিগন্তজোড়া ডাকাতে গাড়ীর মাঠটা পেরোতেই মনে যা একটু ভয় ধরে। মেঘাইয়ের চিতানো বিশাল বুকটাও দুরু দুরু করে ওঠে। ঠগ হলে এই উঠ্‌তি বয়েসে এক হাতে বেশ ক'টার মহড়া নিতে পারে মেঘাই। কিন্তু বুনো জন্তু জানোয়ার ? তিন পুরুষের সর্দার ওরা। সেই কবে ওদের বংশের গগন মাঝি সর্দার হয়েছিলো, আজও তাই চলে আসছে। দীঘল পেশালি চেহারা, মাথাভর্তি কোঁকড়া চুলে মেঘাই যেন সেই গগনেরই প্রতিবিম্ব। বুক

চিতিয়ে টান হয়ে দাঁড়ালে আশপাশের দশটা গ্রামের সমবয়স্ক ছেলেরাও রীতিমতো আদব রেখে কথা বলে।

কেনাবেচার ধান্ধায় মা'র দেওয়া ফলারটা খাওয়ার কথা আর মনেই ছিলো না ওর। ক্ষিদেটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে তাড়াতাড়ি হিসেব করে পয়সা কড়ি মহাজনের কাছ থেকে বুঝে নিয়ে সংসারের জন্য সাপ্তাহিক কিছু টুকিটাকি জিনিষপত্র কিনে হাটের থেকে বেরিয়ে পড়ে। শিবনিবাসের মন্দিরে য'ওয়ার আগে ঘাটে হাত মুখ ধুয়ে ফলার খেয়ে মন্দিরে গেলেই হবে। হাটবার বলে সন্ধ্যের পরও মন্দির খোলা থাকে। সাঁঝের মুখে পূজো দিয়ে মা'র জন্য প্রসাদ নিয়ে বাড়ী ফিরবে।

শিবনিবাসের ঘাটে পেঁাছতে পেঁাছতে বেলা পড়ে আসে। সূর্যটা কুষ্টিয়া মেহেরপুর পার হয়ে দূরের দিগন্তকে রাঙিয়ে কোন্ ভিন দেশের দিকে পাড়ি জমিয়েছে। এঁকে বেঁকে এগিয়ে আসা মাথাভাঙা নদীর বুকে সেই অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি পড়েছে। সিঁদুর রঙে রাঙা হয়ে উঠেছে ঢেউগুলো।

ঘাটে এসে দেখে নদী পার হবার নৌকোটা যাত্রী নিয়ে ওপারে চলে গেছে। ও ঘাটে যাত্রী জমলে তবে পার হয়ে আবার এ ঘাটে আসবে। জলে নেমে হাতমুখ ধুয়ে কাপড়ের খোটায় হাত মুখ মুছে ঘাটের পাশের অর্জুন গাছটার নীচে বসে মেঘাই।

সূর্যটা ধীরে ধীরে ঢলে পড়ছে। ওপারে দিগন্তছোঁয়া মাঠের মধ্যে ইতস্তত ছড়ানো ছিটানো কয়েকটা তালগাছ বিশাল আকাশটার নীচে নিঃসঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

ও ঘাট ছেড়ে এ ঘাটে এসে নৌকোটা ভিড়েছে কিনা দেখতে মেঘাই নজর ঘোরায়। কিন্তু না; নৌকোটা মাঝ নদীতে। আর এপারের ঘাটে ওরই মতো ওপারে যাবার প্রত্যাশায় ইতিমধ্যে আরেকটা মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটার দিকে দৃষ্টি পড়তেই মেঘাইয়ের অতো বড়ো বিশাল বুকটার অন্তিম গহিনে এক ঝলক রক্ত চলকে ও'ঠে। মেঘাই যেখানে বসে আছে, সেখান থেকে অবশ্য স্পষ্ট দেখা যায় না। মেয়েটার আবছা অবয়বে বেলাশেষের কয়েকফালি

রোদ এসে পড়েছে। পরনে লালপেড়ে শাড়ী। হাতে মন্দিরে যাবার জন্য পুজোর ফুল। দিনের আলো আর সন্ধ্যার অস্পষ্টতার সঙ্গমে দাঁড়ানো মেয়েটাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে।

নৌকোটা পাড়ে ভিড়লে মেঘাই নৌকোয় উঠে একেবারে গলুইয়ে গিয়ে বসে। মেয়েটা অবগুণ্ঠিতা হয়ে নৌকোর মাঝামাঝি জায়গায় বসেছে। সোজাসুজি ওর দিকে তাকাতে লজ্জা করে মেঘাইয়ের। আড়ালে আবডালে লুকিয়ে চুরিয়ে যে দেখবে তারও তো উপায় নেই। কারণ মেয়েটা ওর দিকে পেছন ফিরে কেষ্টগঞ্জের দিকে তাকিয়ে আছে। হয়তো বা একমনে কিছু দেখছে।

সামনের জলের ওপর মেয়েটার প্রতিবিম্ব পড়েছে। মাথাভাঙার ছোট ছোট ঢেউয়ের চঞ্চলতায় প্রলম্ব হয়ে পড়া মেয়েটির প্রতিবিম্বটা যেন একটু কাঁপছে। নাকের নোলক আর চোখের থির বিজুরী দৃষ্টিতে অপরূপা। এই ধরনের মেয়ে ভীমপুর অথবা আসাননগর কেন, খোদ কৃষ্ণনগরেও মিলবে কিনা সন্দেহ।

যতক্ষণ নৌকোটা ওপারে না পৌঁছোয়, একদৃষ্টিতে মেঘাই তাকিয়ে থাকে জলে-পড়া মেয়েটার প্রতিবিম্বের দিকে। কখনো মেয়েটির চাউনিতে উদাসীনতা আর কখনো বা চঞ্চলতার ছাপ ফুটে উঠেছে। ঘাটে ভিড়লে মেঘাই গলুই থেকে আগে মাটিতে নেমে একটু সরে গিয়ে ওর নামার পথ করে দেয়।

ঘাট ছেড়ে কয়েক পা এগোলেই সার দেওয়া শিবমন্দিরগুলো। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলের তৈরী। মন্দিরে শঙ্খধ্বনি, আরতির শব্দ। বেলাশেষের প্রৌঢ় ম্লানতা আর সামনে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়া। মেয়েটা—ওকে যেন অচেনা অজানা রহস্যময় এক জগতে নিয়ে যায়। যার এক হাঁকে আশেপাশের এতোগুলো গ্রামের ছেলেদের বুকে হাঁফ ধরে, সেই মেঘাইয়ের নিজেকে নেহাৎই বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে আসা লাজুক যুবক বলে মনে হয়। বুকটার একদিকে আশা আর আকাংখা, অপরদিকে লজ্জা আর অপরিচিতাকে গোপনে দেখা এবং ভালো লাগার সংকোচে কেঁপে কেঁপে ওঠে। মেয়েটি সিঁড়ি বেয়ে বাঁ পাশের জোড়া মন্দিরের একটার পৈঁঠাতে ওঠে। চারিদিকে

দৃষ্টি মেলে কি যেন দেখে। তারপর পুজো দিতে মন্দিরের ভেতরে ঢোকে।

মেঘাই স্থির হয়ে কিছুক্ষণ এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ দেখা মেয়েটা যেন ওর শরীরের সমস্ত শক্তি সঙ্গে নিয়ে গেছে। সামনের শূন্য মন্দিরের প্রাঙ্গণটা যেন বড়ো বেশী শূন্যতায় ভরা। কই, এর আগে তো নিজেকে এতো একা আর শূন্য বলে মনে হয়নি! মেঘাই যেদিন লাঙলে হাত দিতে শিখেছে, মা তো সেদিন থেকেই মেয়ে দেখার কথা বাবা বিশ্বম্ভরকে বলে আসছে। মেঘাই-ই বারবার মা'কে বাধা দিয়েছে। মনে হয়েছে, বিয়ে করে ঘরের বউয়ের আঁচলে বাঁধা পড়ার চেয়ে অনেক ভালো এই মুক্ত জীবন। সারাটা দিন লাঙলের পেছনে রোদ বৃষ্টিতে মাটির বুকে সম্ভাবনার আশা জাগানো, আর সন্ধ্যের পর গ্রামের পাশের মাঠে বসে সমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে বাঁশি বাজানো অথবা দল বেঁধে যাত্রা করা।

গতবার নতুন পাট ওঠার পর গাঁয়ের ছেলেরা মাথুর পালা করেছিলো। তাতে সবাই একরকম জোর করেই ওকে কৃষ্ণ সাজিয়েছিল। যাত্রাদলের নেপথ্যে বাঁশি বাজালেও পাদপ্রদীপের আলোয় এতো লোকের মুখোমুখি ও আর কখনো হয়নি। স্বাভাবিক ভাবেই এক দিকে লজ্জা আর অন্য দিকে দ্বিধা—দু'য়ের মাঝখানে যাত্রার আগের দিন ক'টা ঘোরের মধ্যে কেটেছিলো।

তারপর একদিন সন্ধ্যায় আদল গায়ে মুখে রঙ মেখে সত্যি সত্যিই যাত্রার আসরে নেমেছিলো। এতোগুলো লোকের উপস্থিতিতেও মার পাশে বসা শ্যামলা মেয়েটা নজর এড়ায় নি। ওর অভিনয়ে মেয়েটা হাসতে হাসতে মার কোলের ওপরেই ঢলে পড়েছিলো। আবার কিছুক্ষণ পরে রাধার বিরহে ওর ব্যাকুল বাঁশরি শুনে সেই মুখটাই বিষাদে ভরে উঠেছিলো। মেঘাইয়ের দৃষ্টি এড়ায় নি মেয়েটার অভিব্যক্তি। যাত্রার শেষে সবাই যখন ওকে ঘিরে ধরে ওর প্রশংসায় ব্যস্ত, তখন মেয়েটাও মার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু কিছু বলতে পারে নি। নতমুখে মার পাশে দাঁড়িয়ে তির্যক দৃষ্টিতে শুধু ওকেই দেখছিলো।

পরে খোঁজখবর করে জেনেছিলো মেয়েটি মা'র গঙ্গা সইয়ের মেয়ে। মা-ও ক'দিন হাবেভাবে আর ইসারা ইংগিতে ওকে বোঝাতে চেয়েছিলো যে মেয়েটির ওকে ভালো লেগেছে। কিন্তু মেঘাই বুঝে-সুঝেও তা' কানে তোলে নি। মেয়েটিকে ভালো-লাগার চেয়েও মেয়েটির যে ওকে ভালো লেগেছে—সেটাই ওর মনের প্রহরগুলোকে ভরিয়ে রেখেছিলো। পরের ক'দিন মনটাও ছুটেছিলো ওদিকে। কারণে অকারণে মা'র মুখে মেয়েটির রূপ অথবা গুণের প্রসঙ্গ শুনতে ভালোই লাগতো। ওর অভিনয়ে খুসীতে উচ্ছল অথবা বাঁশের বাঁশীর করুণ মূর্ছনায় বিষাদে ভেঙে পড়া সেই দৃষ্টির মাঝে খুঁজে পেতে ইচ্ছে যেতো।

কিন্তু তবু কেন যেন বিয়ে করে ঘর সংসারী হ'তে ইচ্ছে যায় নি। সংসারী হওয়া মানেই তো চার দেওয়ালের মধ্যে নিজেকে বন্দী করা। গণপতি, নটবর অথবা শ্রীদামকে তো চোখের ওপরেই দেখছে। কৈশোর পেরোবার আগেই বিয়ে করে যৌবনের প্রারম্ভেই কেমন বুড়িয়ে গেছে। যেখানেই থাক্, রাত দু'প্রহর শেষ হবার আগে ঘরে ফেরা চাই। কিন্তু মেঘাই? হাতে বাঁশি আর পিঠের ওপর চাদর ফেলে যেখানে ইচ্ছে গেলেই হলো। সেই যশোর অথবা বর্ধমান—যে ক'রাত ইচ্ছে কাটিয়ে আসে। ওর ফেরার প্রতীক্ষায় ঘরে বসে মুখ গোমড়া করার তো কেউ নেই। তবু পরে যখন শুনেছিলো সেই মেয়েটার মেহেরপুরে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, বেশ ক'দিন মনটা বিষণ্ণতায় ভরে উঠেছিলো। নিজেকে অত্যন্ত একলা মনে হয়েছিলো। ইচ্ছে গিয়েছিলো, মেয়েটার সেই ভাসা ভাসা দৃষ্টিটা নিজের মনের ওপর ভাসিয়ে রাখতে। অবশ্য তারপর যাত্রা আর কাজের মধ্যে সব ভুলে গেছে।

কিন্তু আজ এতোদিন পরে মনে হয় সেই অনুভূতিটাই যেন আবার ফিরে এসেছে। তবে অনেক বেশী শক্তি নিয়ে।

সহজ, সরল, গ্রাম্য দৃষ্টি নিয়ে অনেককে দেখার মতো হয়তো বা ওকেও দেখেছে। অপরিচিত পুরুষকে দেখলে মেয়েদের চোখের তারায় যে স্বাভাবিক বিস্ময়টুকু ফুটে ওঠে—সেটাই হয়তো মেয়েটির

দৃষ্টির মাঝে ছিলো। কিন্তু সেই বিস্ময়টুকুই যেন মেঘাইয়ের অতো বড়ো পেশাল বুকের নীচের রক্তকণিকাগুলোতে নতুন উন্মাদনা ডেকে এনেছে। আথালি পাথালি ঢেউ তুলেছে। চেষ্টা করেও পারে নি দৃষ্টিটাকে ওর দিক থেকে ফিরিয়ে নিতে; মনটাকে স্থির করতে। বারবার এক অদৃশ্য আকাংখা আকর্ষণের সূতোতে বেঁধে ওর মনটাকে টেনে নিয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি কোনরকমে পূজোটা সেরে মেঘাই মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে আসে। ধারে পাশের কোন গাঁয়ের মেয়ে হবে নিশ্চয়ই। কারণ দূর গ্রামের মেয়ে হলে নির্জন এই শিব মন্দিরে একলা আসতো না।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে মেয়েটাকে দেখতে না পেয়ে মেঘাই জোড়া মন্দিরের কাছে যায়। দরজাটা খোলা। ও পূজো সারবার আগেই মেয়েটা পূজো দিয়ে চলে গেছে। মনটা খারাপ হয়ে যায়। পায়ে পায়ে ঘাটে ফিরে আসে। নৌকোর মাঝি ওদের চেনা। আর চিনবেই বা না কেন? ওর বাবা বিশ্বম্ভরকে না চিনুক, গগন সর্দারের নাম শোনে নি, এ তল্লাটে এমন লোক খুব কমই আছে। আর মেঘাই তো তারই নাতি। নৌকোর গলুইতে এসে বসতে নারায়ণ মাঝি জিজ্ঞেস করে,—কি ব্যাপার গগন সর্দারের নাতি? বাড়ীর সব খবর ভালো তো?

মেঘাই মাথা নেড়ে জানায়—হ্যাঁ। তারপর বলে,—নারায়ণ কাকা, একটু আগে যে মেয়েটা ঘাটপার হয়ে কেষ্টগঞ্জের দিকে গেল, তাকে চেনো?

ওর প্রশ্নে অবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে নারায়ণ মাঝি বলে,—বাহারের জিজ্ঞাসা করেছো তো? চিনবে না কেন গো? ও তো আমাদের কেষ্টগঞ্জের পরেশ নায়েকের মেয়ে, কুসুম।

মেঘাই চুপ করে যায়। কোন কথা বলে না। বলতে ইচ্ছেও যায় না। কেন ও এতো দেরী করতে গেলো মন্দিরের ভেতরে? পূজো না হয় কাল এসে দিয়ে গেলেই হ'তো। আসাননগর থেকে কেষ্টগঞ্জ আর কতোটুকুই বা পথ? কয়েক রশি মাত্র। এক হাঁকে চলে আসা যায়।

শিবনিবাসের ঘাট পার হয়ে এপারে এসে মেঘাই. ইতিউতি তাকায়। না, পরেশ নায়েকের মেয়ে কুসুম ওর অনেক আগেই চলে গেছে। মনটা বিষাদে ভরে ওঠে।

সেই বিরহের অনুভূতির সঙ্গে মেঘাইয়ের হৃদয়ের বেদনা মিলে যেন সমস্ত প্রান্তরটাকে এই নিরালা নির্জন জ্যোৎস্না ভরা সন্ধ্যায় বিষণ্ণ করে তোলে। বিরহ আকুতিটা মাঠ-ধোয়া আলোর ওপর দিয়ে কেঁপে কেঁপে মিলনের আকাংখা তুলে ভেসে চলে দিগন্তের দিকে।

মেঘাইয়ের সমস্ত মনটা আচ্ছন্ন করে রেখেছে হঠাৎ সন্ধ্যায় শিবনিবাসের ঘাটে দেখা মেয়েটা; সেই জলের দিকে তাকিয়ে থাকা সরল ডাগর দৃষ্টি। হয়তো নিজেকেই দেখছিলো—কিন্তু ওর মন সেই কথা বোঝে কোথায়!

চেষ্টা করেও মেঘাই কিছুতেই ভুলতে পারে না সেই সরল চাউনি, শ্যামলা অবয়ব। মেঘের মতো কালো চুলগুলো শক্ত করে টেনে পেছনে বাঁধা। ছোট্ট কপালের ঠিক মাঝখানে জ্বলজ্বলে খয়রা রঙের কাঁচপোকার টিপ।

ডাকাতে গাড়ীর মাঠের কাছে এসে মেঘাই একটু থমকে দাঁড়ায়। দু'পাশে উদার প্রান্তর প্রায় আকাশকে ছুঁয়েছে। পরিষ্কার আকাশে চাঁদটা সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। গত বর্ষার বৃষ্টি আর মাথাভাঙার থেকে নালা কেটে আনা জল জমেছে রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে। সেই জলে চাঁদ আর হঠাৎ ভেসে আসা মেঘের লুকোচুরি খেলা চলেছে।

মাঠের পাশের একটা বড়ো গাছের নীচে বসে পাগলাটা একমনে গলা ছেড়ে গান গেয়ে চলেছে। ছোটবেলা থেকেই পাগলটাকে দেখে আসছে মেঘাই। সকালে হয়তো বা চৌগাছায়, সন্ধ্যেবেলাতেই আসাননগর অথবা ভীমপুর। আর রাত পোহালেই হয়তো বা চলে যাবে কেষ্টনগর অথবা মেহেরপুর—চুয়াডাঙা পেরিয়ে দূরের কোন গ্রাম অথবা নতুন শহরে। আশ্চর্য মানুষ। কোথাও একসঙ্গে দু'দণ্ড বসে না। কোন গ্রামে একরাতের বেশী কাটায় না।

কেউ জানে না কোথা থেকেই বা আসে; আর কোন্‌খানেই বা

যায়। মাঝে মধ্যে আবার বেশ কিছুদিনের জন্য দেখা নেই, হঠাৎ আবার দেখা যায় গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপে বসে লালন-ফকির, সিরাজ সাঁই অথবা পঞ্চু শাহ্ প্রভৃতি আউল বাউলদের গান ধরেছে। কী জাত, কোথায় বাড়ী তা' কেউ জানে না। জাতের কথা জিজ্ঞেস করলেই গাইবে ঃ

ছুন্নৎ দিলে হয় মুসলমান,
নারীলোকের কি হয় বিধান ?
বামন চিনি পৈতার প্রমাণ,
বামনী চিনি কি ধরে ?
কেউ মালা, কেউ তসবী গলায় ;
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কার রে ॥

রমজানে দরগায় পাতা পাতে, দুর্গা অথবা কালীপূজোয় আবার চণ্ডীমণ্ডপে এসে প্রসাদ নেয়। আর ডিসেম্বরের শেষে বড়োদিনে কেষ্টনগরের বড়ো গীর্জায় যায়। মসজিদে যেমন নমাজ পড়ে কলমা নেয়, মন্দিরেও প্রণাম করে আশীর্বাদ চায়। আবার রোববারের সকালে গীর্জার মাদার মেরী আর যীশুখৃষ্টের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বুকে ক্রশ আঁকে। প্রয়োজনে আল্লার নামে কসম খায়, দেব-দেবীর নাম করে দিব্যি কাটে আবার যীশুর নামেও শপথ নেয়।

মেঘাই বাঁশিটা বন্ধ করে একমনে শোনে পাগলটা গাইছে ঃ

আপনি আপনার মনের না জান ঠিকানা।
পরের অন্তরে সে যে সমুদ্দুর, কিসে যাবে জানা ॥

গানের কথা ক'টা মনের কন্দরে গিয়ে আঘাত করে। সত্যি তো শিবনিবাসের ঘাটে মেঘাই যাকে দেখেছে, তার বাইরের রূপ দেখেই মেঘাই তাকে ভালবেসে ফেলেছে। মনে মনে নিজের করে চেয়েছে। কিন্তু পরেশ নায়েকের মেয়ে কুসুম ? তার মন তো অথৈ বর্ষার মাথাভাঙার জল। নৌকোয় বসে থাকতে মেয়েটা চকিতে একবার দৃষ্টি তুলে ওকে দেখেছিলো ; মেঘাইয়ের দৃষ্টির ওপর সেই দৃষ্টি

পড়েছিলো। মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। আবার মেয়েটা ফিরে তাকিয়েছিলো জলের দিকে। সেই দৃষ্টিতে বিস্ময়ের চেয়েও ছিলো বেশী কৌতূহল। হয়তো বা গ্রামের যাত্রার আসরে ওকে দেখে থাকবে। সেই কৌতূ-হলটাকেই মেঘাই বিস্ময় মনে করে নানারঙের সূতোয় বুনে স্বপ্ন দেখছে।

আর পরের অন্তর, সে তো অজানা সুবিস্তীর্ণ সমুদ্র বিশেষ। একরাশ অপরিচিত ঢেউয়ে ভরা। উপকূলের নিশানা তো সেখানে গড়ঠিকানায় উধাও। নইলে ওরই বন্ধু নিধর মণ্ডল বাপ্‌-মা মায় জাত পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে পাশের গাঁয়ের যে মেয়েটাকে ভালোবেসে-ছিলো, সেই লায়লা বিয়ের মাস ভালো করে ঘুরতে না ঘুরতেই মাজদিয়ার পাটের আড়তদার মজিদের সঙ্গে পালবে কেন? কই, এতো করেও তো নিধর লায়লার মন পায়নি। পারে নি ধরে রাখতে। মেয়েদের মন, সে যে আকাশের চেয়েও বেশী রহস্যে ভরা।

এলোমেলো ঘুরে বেড়ানোতে বেশ দেরী হয়ে যায়। চাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখে প্রথম প্রহর প্রায় পার হয়ে এসেছে। ও বাড়ী না ফেরা পর্যন্ত মা দাওয়ায় অপেক্ষা করবে। আর তার ওপর সঙ্গে পাটবিক্রীর এতোগুলো কাঁচা টাকা রয়েছে।

চুয়াডাঙার আকাশে চাঁদটা উঠেছে। এখনো অবশ্য ঘোলাটে দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। সারি সারি শিবমন্দিরের চূড়াগুলো আবছা অস্পষ্ট হয়ে গেছে সেই হাল্কা আঁধারে।

পাটের গাড়িটা মুনিষ ধনেশের সঙ্গে তুপুরের কিছু পরেই বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছে। একা একা চাঁদের আলোয় নিরালা নির্জন পথে আপন মনে পথ চলার যে রোমাঞ্চকর মাদকতা আছে, সেটাই যেন ওকে আনন্দে উদ্বেল করে তোলে।

মাঠ পেরিয়ে বড়ো রাস্তায় এসে ওঠে মেঘাই। পেছনে কেষ্টগঞ্জের পাটের বড়ো বড়ো আড়ত আর আড়তদারদের বাণিজ্যকেন্দ্র। এপাশ ওপাশের গ্রামগুলো থেকে মাঝে মাঝে একটা তু'টো গরুর গাড়ী কেষ্টগঞ্জের আড়তে যাচ্ছে। অথবা আড়তে মাল পৌঁছে দিয়ে গ্রামে ফিরে চলেছে।

গ্রামে ঢোকার মুখে চণ্ডীমণ্ডপে দেখে তখনো আলো জেলে তাসখেলা চলছে। সবেমাত্র নতুন পাট জমিন ছেড়ে মহাজনের গদীতে গিয়ে উঠেছে। সুতরাং অল্পবিস্তর সব চাষীদের হাতেই কাঁচা টাকা। মনেও তাই ফূর্তি। নইলে সন্ধ্যের ঘোর লাগার আগেই চণ্ডীমণ্ডপ নিঝুম হয়ে যায়। যতোদিন পাটের টাকা হাতে থাকবে, ততোদিন হৈ-হুল্লোড় চলবে। তারপর আবার দিনমানে লাঙল ঠেলবে আর রাতে ঘরে বসে খড়ে অথবা মাথাভাঙায় মাছ মারার তাগিদায় খেপ্‌লা জাল বুনবে। হাটে বিক্রী করে দু'টো পয়সা হাতে পাবার লোভে খেজুরপাতা আর কঞ্চির ফালি দিয়ে টোকা, পলো তৈরী করবে। সে সময় গজল্লা করার মতো কারোর আর মন মেজাজ থাকে না।

বাড়ীতে এসে দেখে মা তখনো দাওয়ার ওপরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারে ওর দেরী করে ফেরায় মা উৎকণ্ঠিত। বাবা চণ্ডীমণ্ডপ থেকে ফেরে নি।

—কীরে মেঘাই এলি ?

মা'র জিজ্ঞাসায় এগিয়ে এসে মেঘাই উত্তর দেয়,—হ্যাঁ মা, এসেছি। শিবমন্দিরে পূজো দিয়ে ফিরতে ফিরতে একটু দেরী হয়ে গেলো। একটু সময় চুপ করে থেকে বলে,—নে মা টাকাগুলো ধর। বাবা এলে দিয়ে দিস। আর গামছাটা দে। ঘাট থেকে একেবারে নেয়ে আসি। যা ময়লা জমেছে।

পূজোর প্রসাদ আর টাকাগুলো মা'র হাতে দিয়ে ঘাটে যায় মেঘাই। স্নান সেরে এসে খেতে বসে। বিশ্বম্ভর এলে হিসেব নিকেশ বুঝিয়ে দিতে হবে।

খেতে খেতে মা জিজ্ঞেস করে,—কীরে মেঘা হাট জমেছিলো কেমন ?

মেঘাই ছোট্ট উত্তর দেয়,—ভালো।

ওর ছোট ছোট উত্তরে আর স্থির ভাবভঙ্গিতে মা একটু অবাক হয়। কারণ হাট থেকে ফিরলে মা'র সঙ্গে ওর কথার যেন আর শেষ হ'তে চায় না। কি কি নতুন জিনিষ উঠলো, হাটের অবস্থা প্রভৃতি

একটানা বলে চলে।

কিন্তু আজ যেন ওর কোন কিছুতেই মন লাগে না। মনটা সেই সেই একজায়গাতেই পড়ে রয়েছে। চেষ্টা করেও কিছুতেই একটা বিন্দুতে কেন্দ্রায়িত করতে পারছে না। শিবনিবাসের ঘাটের হঠাৎ সন্ধ্যা, রাস্তার ওপরের আকাশ থেকে গাছের পাতায় পাতায় আর ক্ষেতের বুকে ঝরে পড়া চন্দন-রঙা জ্যোৎস্না, সব ছাপিয়ে বারবার ভেসে উঠছে শুধু একটা মুখ, যা ওকে অস্থির করে তুলেছে।

—চুপচাপ বসে আছিস যে। খাচ্ছিস না কেনে?

—এমনি। খিদেটা তেমন জোর লাগে নি।

—হাটে কিছু খেয়েছিস নাকি?

—না, কিনে তো কিছু খাইনি। তোর দেওয়া ফলার-ই খেয়েছি। তা'ও সন্ধ্যের ঝোঁকে।

শরীর খারাপ করে নি তো?

কথাটা শেষ করে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ওর কপালে হাত রেখে মা বলে,—না, শরীর তো ঠাণ্ডাই দেখছি।

খেয়ে দেয়ে উঠে মেঘাই একবার ভেবেছিলো চণ্ডীমণ্ডপটা ঘুরে আসবে। নটবর গণপতি ফিরেছে কিনা খোঁজ করবে। কিন্তু খাওয়া দাওয়া সেরে চণ্ডীমণ্ডপে যেতে আর ইচ্ছা করে না। পরেশ নায়েকের মেয়ে মনের মধ্যে যে ঘোর লাগিয়ে দিয়েছে, সেটা যেন ইচ্ছে যায় সযত্নে জাগিয়ে রাখতে। নটবর আর গণপতির কাছে গেলে সেই তো একই গল্প। কদমতলীর ঘাটের কোন্ ডেরাতে নতুন মেয়ে মানুষ এসেছে, বারাসাত, বসিরহাট অথবা বর্ধমানের মহাজন টুলি থেকে; কিংবা পুরোন কোন্ নষ্ট মেয়েটাই আজ একেবারে নতুন হয়ে ওদের চোখে রঙ ধরিয়েছে। তারই কাহিনী। আজ আর ভালো লাগে না মেয়েমানুষের আদিরসের কেচ্ছা শুনতে।

ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে মেঘাই। ছিটে বেড়া নিজে হাতে কেটে জানালা করে নিয়েছে। সেই জানলাটা দিয়ে অনেকটা দূর পর্যন্ত নজরে আসে।

মেঘাই শুয়ে শুয়ে তাকিয়ে দেখে হাল্কা চাঁদের আলো বেশ গাঢ়

হয়েছে। ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্তে। চাঁদটা আর সেই জায়গায় নেই। ইতিমধ্যে আকাশের অনেকটা উঁচুতে উঠে গেছে। নিস্তব্ধ গ্রামটার ওপর কে যেন নির্জনতার একটা চাদর সবার অলক্ষ্যে বিছিয়ে দিয়েছে। আকাশ আঙিনা ঘিরে সাদা সাদা মেঘের খণ্ড ভেসে চলেছে। দু'একটা তারা চাঁদের স্বচ্ছ আলোয় নিষ্প্রভ হয়ে লজ্জায় মুখ লুকিয়ে মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে। অন্য কোন পাশের গ্রামে হয়তো বা নতুন-ওঠা পাটের পয়সা পেয়ে কৃষ্ণলীলা জুড়ে দিয়েছে। বাতাসে ভর দিয়ে ভেসে আসছে বাঁশীর কোন পরিচিত সুর, অথবা গানের কলির ভগ্নাংশ। কিন্তু সব ছাপিয়ে স্মৃতিতে ভেসে রয়েছে সেই মুখ—মুখের আভাস। আলো আর আঁধারের সঙ্গমে দেখা। পরেশ নায়েকের মেয়ে কুসুমের কথা ভাবতে ভাবতেই একসময় মেঘাই ঘুমিয়ে পড়ে।

॥ দুই ॥

সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরী হয়ে যায়। সূর্যটা অনেকক্ষণ উঠে গেছে। রোদের টুকরো এসে পড়েছে উঠোনের ধানের মড়াই আর শুকোতে দেওয়া পাটের স্তূপের ওপর বাবার গলা ভেসে আসছে। নিশ্চয়ই ওর উঠতে দেরী দেখে মুনিষদের পুকুরের জলে ভেজানো পাট ছাড়াইয়ের জন্য তাগাদা দিচ্ছে।

মুনিষদের তাড়া দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া, জমি থেকে পাট তোলা, তারপর পুকুরের জলে পাট পচানো থেকে সুরু করে রোদে শুকানো, হাটে নিয়ে বিক্রী করা পর্যন্ত কাজগুলো মেঘাই-ই এখন করে। আগে বিশ্বম্ভর করতো। জমির পাট সব উঠে গেছে উঠোনে। সেই জমিতে নিড়ানি দিয়ে আবার অন্য ফসল বুনতে হবে।

মা এর মধ্যেই বার কয়েক উঁকি দিয়ে গেছে। মেঘাই টের পেলেও বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে নি। গত রাতের স্বপ্নটাই তখন পর্যন্ত গায়ে-মনে জড়িয়ে রয়েছে। স্বপ্নের রেশটুকু যেন ওকে বিছানা ছেড়ে উঠতে দিচ্ছে না। মনে হয় দিনমানে হাজার কাজের মাঝে হারিয়ে

যাবে সে স্বপ্নের সুখ! অনুভূতিটা। হোক্ না স্বপ্ন। বাস্তবে তার রূপায়ণ সম্ভব না হলেও মনের ওপর ভাসিয়ে রেখে হৃদয় দিয়ে স্পর্শ করতে দোষ কী! এক একবার মনের ভেতরে অন্য চিন্তা ও দ্বন্দ্ব আনে। রাতের স্বপ্নে দিনের আলোয় নিজেকে মগ্ন রাখার সার্থকতা কতোটুকু? শুধু দিনের কাজ তা'তে নষ্ট।

বিছানা ছেড়ে উঠে হাতমুখ ধুয়ে রান্নাঘরের সামনে এসে জল-চৌকিটা টেনে নিয়ে বসে মেঘাই। মা রান্নায় ব্যস্ত। ওর বসার শব্দে মা পেছন ফিরে তাকায়। বলে,—চা খাবি মেঘা? করবো?

—করো।

মা চা করে ওর হাতে দেয়। ওকে গম্ভীর আর উদাসীন দেখে জিজ্ঞাসা করে,— কি হয়েছে রে তোর? কাল থেকেই মুখে রা কাটছিস না। ভালো মতো খাচ্ছিস না।

— হবে আবার কি? এমনি। ভালো লাগছে না তাই। চায়ের বাটিটা শেষ করে মাটিতে রেখে মেঘাই উঠে পড়ে। গণপতি আর নটবরের বাড়ী হয়ে চণ্ডীমণ্ডপে একবার যেতে হবে। কাল হাটে যেতে যেতে শ্রীদাম বলেছিলো যাত্রার কথা। প্রতিবছরই হয়ে থাকে। পাট উঠলে হাতে টাকা থাকতে থাকতে একটু আনন্দ না করলে সারা-বছরটাই কিরকম নিরেস হয়ে যায়। এখন আনন্দ না করলে এর পরে তো আবার টোকা মাথায় মাঠে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়তে হবে। জমিতে লাঙল দাও, মই টানো, বীজ ছড়াও। চারা উঠলে বাছো, হাপড়ে দাও, ফসল পাকলে পাকা ফসল বেছে বেছে কুটো বাঁধো। হাজারটা কাজ। তখন চাষীদের ঘরের বউয়ের মুখটুকুও সুস্থিরভাবে দেখার সময় থাকে না। জমির পেছনেই সময় কাটে।

নটবরের বাড়ী গিয়ে দেখে নটবর তখনো ঘুম থেকে ওঠে নি। বুঝতে পারে কেষ্টনগর থেকে নেশা করে নিশ্চয়ই অনেক রাতে বাড়ী ফিরেছে। ঘুম ভেঙ্গে খোয়াড়ি কেটে চণ্ডীমণ্ডপে আসতে আসতে বেলা হবে। গণপতি, শ্রীদাম ওর আগেই মণ্ডপে চলে গেছে।

গ্রামটা ঘুরে মেঘাই চণ্ডীমণ্ডপে আসে। সকাল বেলাতেই গজল্লা একেবারে জমজমাট হয়ে উঠেছে। মেঘাই আসতে গণপতি বলে,—

তোকে এতো করে বললাম মেঘা, তুই তো গেলি নে। কদমতলী কাল একেবারে ভরপুর ছিলো।

—থাক গণা, সাত সকালে এইসব গজল্লা আমার ভালো লাগে না।

ওর কথায় গণপতি তির্যক একটা হাসির টুক্‌রো ঠোঁটের ওপর ছড়িয়ে অন্যান্য বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলে,—কেষ্টর ছিলো হাজার গোপিনী, কিন্তু আমাদের মেঘাই যে দেখছি এক রাধাতেই মজে আছে। কোথায় এমন মজলি রে বাবা?

—গণা, যাত্রার কথা বলবি তো বল, নইলে আমি জমিতে চললাম।

মেঘাই ঘুরে দাঁড়ায়। গণপতি বুঝতে পারে, যে কারণেই হোক্ মেঘাইয়ের আজ এসব ভালো লাগছে না। জোর করে বলতে গেলে, যা জেদী ছেলে আসরে হয়তো আর বসবেই না।

চণ্ডীমণ্ডপ থেকে বেরিয়ে মেঘাই জমিতে আসে। গোটা দুই মুনিষ কাজে ব্যস্ত। পাট তুলে নেওয়া জমিতে নিড়ানি দিয়ে রবিশস্য বুনবে। মেঘাইয়ের ইচ্ছে করে কাজের মাঝে গত সন্ধ্যার স্মৃতিটা ভুলে থাকতে। কাজের ভিড়ে মনটাকে বিলিয়ে দিতে। কিন্তু পারে না। ভেতরের অনুভূতিশীল মনটা সব সময়েই অনুরাগের তুলিতে অনুপম একটা মুখ এঁকে চলেছে। চেষ্টা করেও মেঘাই পারে না সে মুখ মুছে ফেলতে, নিদেন ক্ষণিকের জন্য হলেও ভুলে থাকতে।

সোজা ঘাটে গিয়ে স্নান করে খাওয়া দাওয়া সেরে একলা এসে দাওয়ায় বসে। দাওয়ার একপাশের গাছের তলাটা মেঘাই-ই বাঁধিয়েছিলো। সন্ধ্যের পর বসে গল্প-টল্প করা যাবে বলে। নিশ্চুপ উদাসী দুপুর। উঠোন ভর্তি পাট মুনিষরা তুলে রাখছে। পাজা করে রাখা নতুন ওঠা পাট আবার রোদে শুকোতে দিচ্ছে। বাতাসে সেই কাঁচা পাটের গন্ধ! পাত্‌লা রেশমের মতো আঁশগুলো এলোমেলো উড়ে বেড়াচ্ছে। কয়েকটা শঙ্খচিল দূরে দিগন্তের কাছাকাছি ক'টা গাছের মাথা ঘিরে একমাগাড়ে পাক খেয়ে চলেছে। পাশের ঝোপঝাড় থেকে

একটা ঘুঘু একটানা অনেকক্ষণ ধরে ডেকে চলেছে। হয়তো বা ওর পথহারা সঙ্গীকেই খুঁজছে। রোদের রশ্মিগুলো চিক্‌চিক্‌ করছে।

রঙিন কল্পনায় ভরে ওঠে মেঘাইয়ের মন। ছাদনা তলায় বিয়ের বেশে ও দাঁড়িয়ে আছে। মুখোমুখি পরেশ নায়েকের মেয়ে সালংকরা কুসুম। সীমন্তে নতুন সিঁদুর ঝিলিক্‌ হানছে। চোখের কোণে টানা সুর্মা। চাউনিতে লজ্জার আভাস। ওর দিকে লুকিয়ে লুকিয়ে এক-আধবার দেখছে। ওর দৃষ্টির ওপর দৃষ্টি পড়লে লাজুক নম্রতায় অন্য-দিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। লালচেলী ঢাকা মুখে মেঘাইকে দেখার, কাছে পাবার আকাংখা তীব্র আকুলি নিয়ে ফুটে উঠেছে। আর ? বাকীটা মেঘাই আর ভাবতে পারে না।

কুসুমের কথা ভাবতে ভাবতে কখম ঘুমিয়ে পড়েছে মেঘাই নিজেও টের পায় নি। এই সোনা-রোদ, শঙ্খচিল ডাকা উদাসী দুপুর, পাটের গন্ধভরা বাতাস—ওকে যেন মাতাল করে দেয়।

—এই মেঘা অবেলায় পড়ে পড়ে এখানে ঘুমোচ্ছিস কেন ?

মা'র ডাকে মেঘাইয়ের চটকা ভাঙে। তাড়াতাড়ি বসে। দেখে; সামনে মা দাঁড়িয়ে ·

—মা, আমার পাশে একটু বসবি ?

—কেন রে ?

—এমনিই। বোস না একটু।

মা বসে। ছোটবেলা থেকেই একটু বেশীরকম আদুরে আর জেদী। যা মুখ দিয়ে বার করবে, তা করিয়ে ছাড়বে। অবশ্য জন্ম থেকেই মা-বাপের নয়নের মণি বলে এটা আরো বেশী হয়েছে। আর হবেই বা না কেন ? সুরধনীর পর পর কয়েকটা পেটে এসেও নষ্ট হয়ে গেছে। প্রথমটা পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলে তাকালেও বেশীক্ষণ বাঁচে নি। আর পরেরটা ভরা মাসে পুকুর ঘাটে বাসন ধুতে গিয়ে আছাড় খেয়ে নষ্ট হয়েছে।

তারপর বেশ কিছুদিন পেটে আর কেউ আসে নি। মেঘাইয়ের বাপ তো ছেলেপুলের মুখ দেখার আশা ছেড়েই দিয়েছিলো। যে মানুষটা ওকে অতো দেখে বেছে ঘরে তুলেছিলো, সেই মানুষটাই তখন

ভালো করে কথা পর্যন্ত বলতো না। সুরধনীও লজ্জায় মরে যেতো। মাগো, স্বামীর বংশে বাতি জ্বালবার কাউকে দিতে না পারলে আর মেয়ে হয়ে জন্মানো কেন? লজ্জায় দুঃখে লোকে যে দরগার নাম বলেছে সেখানেই গেছে; যে মন্দিরের নাম শুনেছে সেখানেই পুজো দিয়েছে। আউল বাউল ফকির অথবা সাধু সন্ন্যেসীর নাম শুনলেই লোক দিয়ে বাড়ীতে ডেকে আনিয়ে, তার কাছেই সন্তান কামনা করেছে। ব্রত উপবাস যে যা উপদেশ দিয়েছে, এক বাক্যে তাই মেনে চলেছে। তবু এক সময় ওর সঙ্গে সঙ্গে মেঘাইয়ের বাপও হতাশায় ভেঙে পড়েছে। কেষ্টনগরের কোন বড়ো কবিরাজের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছে। কিন্তু সুরধনী ওর মনের দুঃখ বুঝতে পারলেও যায় নি। ভগবান না দিলে কি মানুষ এ জিনিষ দিতে পারে!

তারপর শ্বশুর-শাশুড়ি যখন ছেলের আবার বিয়ের কথা বলেছে, দুঃখে বুক ফেটে গেলেও সুরধনী বারণ করে নি বিশ্বম্ভরকে। সত্যিই তো, সুরধনী যখন পুরুষটার আশা আকাংখাকে রূপ দিতে পারে নি, তখন বাধাই বা দেবে কোন্ মুখে। তবু নিজের স্বামীর পাশে অন্য কোন মেয়ের কথা কল্পনাতে আনতেও বুক জ্বলে গেছে। পাশের ঘরে সতীনকে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে বিশ্বম্ভর শুয়ে থাকবে, আর একলা বিছানায় ছটফট করবে সুরধনী। সতীনের অধর বিশ্বম্ভরের ছোঁয়ায় রক্তিম হবে, কিন্তু ওর? কিন্তু না-ই বা করে কী করে? ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দিকে যে গভীর আকাংখায় বিশ্বম্ভর তাকিয়ে থাকতো, তার চেয়েও বেশী লোভ থাকতো সুরধনীর দৃষ্টিতে। কেন ওর কোল জোড়া অমন কেউ আসে না? বিশ্বম্ভর যদিও বলেছে, অন্য কেউ ঘরে এলেও সুরো, তোকেই আমি ভালবাসবো, আদর করবো। সে শুধু আমায় সন্তান দেবে। কিন্তু এ সংসারের হাল তুই-ই ধরে থাকবি। তবু মন মানে নি। চোখে জল ভরে এসেছে। শেষে দুধ-গোলায় বিশ্বম্ভরের বিয়ের যখন সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, ঠিক তখনই মেঘাই গর্ভে নড়ে চড়ে উঠেছে।

সকালবেলা বিশ্বম্ভর কাজে যাবার মুখেই সুরধনীর মাথাটা ঘুরে উঠেছে, গা'টা বমি বমি করেছে। বিশ্বম্ভরকে ডেকে কানে কানে

বলেছে কথাটা। বিশ্বম্ভর প্রথমে বিশ্বাসই করতে চায় নি।

বলেছে,—শরীর হয়তো এমনি-ই খারাপ লাগছে, সুরো।

ওর কথায় লজ্জায় রাঙা হয়ে সুরধনী প্রতিবাদ করেছে,—চাষী বৌয়ের বুঝি মেঘ চিনতে ভুল হয়? আর এই তো প্রথম নয়। না হয় সাত বছর পরেই হয়েছে। তবু আমি বলছি দেখো।

লজ্জায় ওর সামনে থেকে রান্নাঘরে সরে গেছে সুরধনী। আর বিশ্বম্ভর আনন্দে সেদিন কাজেই যায় নি। বিয়েটা ও পেছিয়ে দিয়েছে। আর প্রতিটি দিন গভীর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করেছে। ওকে কাছে ডেকেছে। আদর করেছে। আর দু'জনে মিলে স্বপ্ন দেখেছে। শেষে একদিন মেঘাই সুরধনীর কোল জুড়ে এসেছে। আর বিশ্বম্ভর আনন্দে দিশাহারা হয়েছে।

জন্মের পর মেঘাইকে যেন একটা মুহূর্তও বিশ্বম্ভর চাউনির আড়াল হ'তে দেয় নি। দুষ্টুমি করলে সুরধনী যখন বকেছে, বিশ্বম্ভর মুখে কিছু না বললেও রাগ করেছে ওর ওপর। স্বামীর গম্ভীর মুখ দেখে সুরধনীর বুঝতে কষ্ট হয় নি। অনেকবার রাগও করেছে বিশ্বম্ভরের ওপর। বলেছে,—ছেলের দুষ্টুমি শাসন না করলে চলবে কি করে? বিশ্বম্ভর এ কথায় আরো বেশী রেগে উঠেছে। ওর সেই নীরব রাগে হাসি পেয়েছে সুরধনীর। হাসতে হাসতেই বলেছে,—আচ্ছা গো আচ্ছা, তোমার ছেলেকে আর কোনদিন কিছু বলবো না। এইবার হল তো? তারপর মেঘাইকে বিশ্বম্ভরের কোলে বসিয়ে দিয়ে ঘরের নিত্যকারের কাজে গেছে। দূর থেকে দেখেছে, বিশ্বম্ভর ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে মুনিষদের পাট ভাঁজ করা, ঝাড়ার কাজ দেখছে। কিন্তু কাজের থেকেও বেশী লক্ষ্য করছে ছেলেকে। অতোটুকু অবুঝ ছেলের সঙ্গে অনর্গল কতো কথা বলে চলেছে।

স্বামীর হাবভাবে ভীষণ হাসি পেতো সুরধনীর। ছেলে যেন আর কারো হয় না। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে গর্বে বুকটা ভরে উঠতো। আর দুধগোলার না-আসা সতীনকে হারিয়ে দিতে পারার আনন্দে বুকের প্রতিটি কোষ, মনের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু খুসীতে বর্ষার মাথাভাঙার মতোই টই-টম্বুর হয়ে উঠতো। এ সবকিছুই ওকে দিয়েছে

মেঘাই। সুতরাং ছোটবেলা থেকেই ওর প্রতিটি সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা সুরধনীকে স্পর্শ করতো। আনন্দে উদ্বেল এবং দুঃখে বিষণ্ণ করে তুলতো।

পাশে বসে ওর গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সুরধনী জিজ্ঞাসা করে,—কী হয়েছে রে তোর মেঘা? কাল থেকে ভাল করে খাচ্ছিস না, মুখ গোমড়া করে বসে আছিস! নটবর তোকে মাছ মারতে পলদার বিলে যাবার জন্যে ডাকতে এসে ফিরে গেলো।

হাতের স্পর্শে মেঘাই বুঝতে পারে স্নেহের বন্যায় মা'র বুক ভেসে গেছে। অনুভব করতে পারে ওর এই হঠাৎ পরিবর্তনে মা'র উদ্বিগ্নতা। মা'র হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে মেঘাই বলে,—মা কাল যখন শিবনিবাসে পুজো দিতে গিয়েছিলাম, তখন কেষ্টগঞ্জের পরেশ নায়েকের বড়ো মেয়েও গিয়েছিলো।

বাকীটা আর বলতে পারে না। দরকারও হয় না। বুঝতে পারে মা ঠিক বুঝে নিয়েছে। তাড়াতাড়ি লজ্জায় মা'র পাশ থেকে উঠে পড়ে। ঘরে গিয়ে বেড়ার গা থেকে কামিজটা টেনে নিয়ে গণপতি নটবরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে।

গণপতি, শ্রীদাম, নটবর পলদার বিল থেকে ফিরে এসে চণ্ডীমণ্ডপে আগামী যাত্রার মহড়া দিতে ব্যস্ত। মেঘাইকে দেখতে পেয়ে নটবর এগিয়ে এসে বলে,—সারাটা দিন পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিস; আমি ভাবলাম শরীর টরীর খারাপ করেছে। তারপরে মুখটা নীচু করে কানের কাছে এনে বলে,—সত্যি করে বল তো মেঘা, শরীর নাকি মন, আসলে কোনটা খারাপ?

ওর কথার সোজাসুজি কোন জবাব না দিয়ে অল্প একটু হেসে মেঘাই দলের পেছনে গিয়ে বসে।

আজকে কালীয়দমনের মহড়া হবে। পায়রাডাঙায় দেখাবার কথা আছে ওদের দলের। কিন্তু মেঘাইয়ের মনে হয় কালীয়দমনের চেয়ে প্রভাস মিলন পালাটা হলেই যেন মনের ভেতরকার তেষ্টাটার সঙ্গে জমতো ভালো। তবু বলতে পারে না। ঘন লজ্জাটাই তা বলতে দেয় না।

মহড়া শেষ করে বাড়ী ফিরে দেখে বাবার ঘরে তখন পর্যন্ত টেমী জ্বলছে অর্থাৎ মা বাবা দু'জনের কেউ-ই ঘুমোয় নি।

সাধারণত মহড়ার দিন ফিরতে ফিরতে দেরী হয়ে যায় বলে ওর ভাত ঘরের কোণে ঢাকা দিয়ে রেখে মা ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘরে ঢুকে দেখে কোণে ভাত ঢাকা দেওয়া রয়েছে। খেতে খেতে মা বাবার আলোচনার ভগ্নাংশ কানে আসে। লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। পেশল বুকের গোপনে আনন্দের ঢেউ ওঠে। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ঘর ভর্তি আঁধারের মাঝে নিজেকে সঁপে দেয়।

॥ তিন ॥

শিবনিবাসের মন্দির থেকে এক অদ্ভুত একটা অনুভূতি নিয়ে কুসুম বাড়ী ফেরে। সন্ধ্যার ঘোর পৃথিবীটার বুকে লেগেছে, তার চেয়েও যেন বেশী ঘোর লাগে কুসুমের চোখে, মনে। বারবার আনমনা করে দেয়।

শিবচতুর্দশীর সারাদিনের উপবাসের পর শিবনিবাসে গিয়েছিলো কুসুম পূজো দিতে। মা আজ বছর দু'য়েক ধরেই অসুস্থ। সন্তানের জন্ম দিতে দিতেই তার ক্ষীণ জীবন আরো ক্ষীণ হয়ে এসেছে। বিছানা থেকে উঠে দাওয়ায় নেমে নড়েচড়ে বেড়াবার ক্ষমতাটুকুও হারিয়েছে। এক একসময় মা'র ওপর সহানুভূতিতে মনটা ভরে ওঠে। মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলেই যেন সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করে নেয়। বড়জোর দুঃখ সহ্য করে উঠতে না পারলে সবার মৃত্যু কামনা করে। তেলবিহীন প্রদীপের মতো শুধু পলতের জোরে মা যেন একটু একটু করে কোন রকমে জ্বলছে। নিভতে গিয়েও নিভছে না।

মাঝে মাঝে বাবার ওপর রাগ হয় কুসুমের। ছোটবেলায় না হয় বুঝতে পারতো না। কিন্তু এখন তো বোঝার বয়েস হয়েছে। আর হবেই বা না কেন? বয়েসের নৌকো তো তেরোর ঘাট পেরিয়ে

চৌদ্দোর বন্দরে নোঙর করার তোড়জোড় সুরু করে দিয়েছে। ওর সমবয়স্কা সই নয়নলতা, ইন্দুমতী কবে বাপের ঘর ছেড়ে অন্যের ঘরণী হয়ে ঘর-সংসার করছে। এখনো পাল-পার্বণে বাপের বাড়ীতে এলে কোলে ছেলে নিয়ে মাথার সামনের সীমন্ত সিঁদুরে রাঙিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে। অথবা হঠাৎ ঘাটের পথে দেখা হয়ে যায়। কুসুমের লজ্জায় তখন মরে যেতে ইচ্ছে যায়। চারপাশের কাপড় টেনে এনে বুকের ওপর জড়ো করে। যৌবন লুকোতে চায়। আর যখন ওরা ছেলেপুলে অথবা সংসারের গল্প করে, তখন কুসুম একমনে শোনে। পরে অবসর মতো একা একা বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওদের বলা কথাগুলো ভাবে। স্বপ্ন দেখে। আপন মনে নিজের আগামী সংসারের ছবি আঁকে।

নয়নলতার মুখে আবার কিছুই আটকায় না। নিজের স্বামীর কথাই এমন করে বলবে যে কুসুমের লজ্জায় মুখ লুকোতে ইচ্ছে যায়। একটা রাতও নাকি ওকে নাজড়িয়ে ধরে ওর সোয়ামীর ঘুম আসে না। নয়নলতা আবার বেশী বাড়াবাড়ি করে বলে। বিয়ে যেন কেউ আর করে না! আর আদর? ভাবতেই শরীরের শিরায় শিরায় লজ্জার শিরশিরানি অনুভব করে কুসুম।

বাবার সন্তান কামনা যেন আর শেষ হ'তে চায় না। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। মা'র অসুস্থতা, সংসারের দারিদ্র্য—কিছুই যেন বাবাকে সে কামনা থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না। নিজে বড়ো হবার পর বাবাকে কোনদিন কোন ভাইবোনকে আদর করতে দেখে নি। এমন কি কুসুমকেও কোনদিন কাছে ডেকে ভালো মুখে দু'টো কথা বলে নি। আর করবেই বা কখন? পেটের দুটো নুনপান্তা জোগাড় করতেই তো দিনমান পার হয়ে যায়। কার জমি এ বছর ভাগে পাওয়া যাবে, কার বাড়ীতে বিয়ে অথবা অন্য কোন উৎসবে বাড়তি লোক লাগবে, তারই খোঁজখবর করবে, না ওদের দিকে তাকাবে! তবে সন্তানের প্রয়োজনটাই বা কী, তা' কুসুম অনেক ভেবেও পায় না। আর তার ওপর বড়ো হয়ে পর্যন্ত বছর না ঘুরতেই মা আতুড়ে গেলে সমস্ত সংসারের কাজ ওকে একটা হাতেই করতে হয়। সবচেয়ে বেশী

লজ্জা করে যখন মা'র আঁতুর ওকে তুলতে হয়।

অনেকদিন আড়াল থেকে মা বাবার কথা কানে এসেছে কুসুমের। সত্যি তো, এতো অভাবের সংসারে এতো মুখ বাড়ানো কেন? বাবা তো কাজে অথবা কাজের খোঁজে বাইরে বাইরে কাটায়। কিন্তু দাওয়ার এধার ওধার ঘুরে বেড়ানো এতোগুলো ছেলেপুলের ক্ষুধার তাড়না তো ঘরে বসে মাকেই সহ্য করতে হয়। কিন্তু মা অনেক চেষ্টা করেও বাবাকে বোঝাতে পারে নি। স্পষ্ট করে বলতে গেলে, বাবা বুঝতে চায় নি।

বাবা প্রতিবারই মা'র অভিযোগের ছোট্ট উত্তর দিয়েছে,—তুমি যদি না পারো তবে বলে দাও, আরেকটা মেয়ে ঘরে আনি। বাবার এই নির্লিপ্ত কথায় মা আর উত্তর দেয় নি। আর কী-ই বা দিতে পারে? বাংলাদেশে মেয়ের তো অভাব নেই। নিশ্চুপে বাবার ইচ্ছেকেই মেনে নিয়েছে, আর দিনের পর দিন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। অবশ্য গতবার আঁতুড় ঘর থেকে বেরিয়ে স্বাস্থ্য ভেঙে পাড়ার জন্য বোধহয় এবারে বছর দুই এক নাগাড়ে রেহাই পেয়েছে।

সকালবেলা বাবা কাজে বেরোবার আগে চা-খাবার, মা'র পথ্যের ব্যবস্থা করতে করতেই বেলা বেড়ে গেছে। তারপর ভাইবোনদের নাওয়ানো খাওয়ানো সেরে সংসারের রান্নাবান্নার কাজ করতে করতে বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। ভাইবোন আর মা'কে খাইয়ে, বাবার ভাত ঢাকা দিয়ে রেখে ছোট বোন সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে মাথাভাঙায় গেছে স্নান করতে। স্নান সেরে গয়লা পিসীর কাছ থেকে কাঁচা দুধ আর কিছু ফলমুল জোগাড় করেছে। বুড়ো শিবের মাথায় দুধ ঢেলে, পুজো দিয়ে তবে সন্ধ্যের মুখে বাড়ী ফিরে কিছু মুখে দেবে।

একবার ভেবেছিলো সুভদ্রাকে নিয়েই শিবমন্দিরে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওকে আর নিয়ে যায় নি। ছোট মেয়ে, এতোটা পথ হাঁটতেও পারবে না। আর সন্ধ্যের ঝোঁকেই যে রকম ঢুলতে সুরু করে, তাতে ওকে নিয়ে পথ চলাই দায়।

কিন্তু ঘাটে এসে মনে হয় সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে এলেই ভালো হ'তো। নৌকোটা ওপারে। ঘাটে একা একা দাঁড়িয়ে কুসুমের অস্বস্তি লাগে। তার ওপর মেঘাইকে দেখে লজ্জাটা যেন আরো চেপে

আসে। পুজোর উপকরণ, মাটির ছোট কলসীতে কাঁচা দুধ আর লালপেড়ে শাড়ীতে নিজেকেও যেন সকাল সন্ধ্যায় সংসারের হাজার খুঁটিনাটি কাজের মাঝে ব্যস্ত কুসুম বলে মনে হয় না।

বাবাকে অনেক বলে কয়ে মা গত বছর গাজনের মেলার থেকে কুসুমের জন্য শাড়ীটা আনিয়েছিলো। বাইরে বেরোবার মোটামুটি একটা কাপড় না হলে চলে কি করে? আর মেয়ে যখন বড়ো হয়েছে। বাবা না ভাবলেও মা'কে তো ভাবতে হয়। মাঝে মাঝে বলেও ফেলে।

—তুই যেমন ডাগর হয়ে উঠেছিস তা'তে মা হয়ে আর চোখ বুজে থাকতে পারিনে।

কুসুম বুঝতে পারে মা'র মনের ব্যথা। কষ্টও হয়। তবু ও কি করবে? যাদের সঙ্গে একসাথে পুতুল খেলেছে, হাত ধরাধরি করে চোর-সিপাই সেজেছে, চোখের ওপর একের পর এক তারা পরের ঘরে চলে গেছে।

মা'র পাশে বসে রুক্ষ চুলগুলোর জট ছাড়াতে ছাড়াতে কুসুম বলে,—মা, তুমি চিন্তা করো না। আমি পরের ঘরে চলে গেলে তোমায় কে দেখবে?

ওর এ কথার পর মা আর কোন কথা বলে নি। চুপ করে থেকেছে। বুঝতে পেরেছে, নিজের মনের আক্ষেপের বেদনা মেয়ের মনকেও স্পর্শ করেছে।

আজ ঘাট থেকে স্নান সেরে ফিরতেই মা ওকে শিবমন্দিরে এই শাড়ীটা পরে যেতে বলেছিলো। কুসুম প্রথমে রাজী হয় নি। ইতস্তত করেছিলো। মনে অবশ্য আরেকটা চিন্তা শাড়ীটা পরে যেতে দ্বিধা এনেছিলো। সত্যি যদি নয়নলতা অথবা ইন্দুমতীর মতো কোন উৎসবের দিন ওর জীবনে আসে! তখন? তখন ও কী করবে? বাবার পক্ষে তো বিয়েতে আবার নতুন শাড়ী দেওয়া সম্ভব নয়। আর সংসারের হাল কুসুম তো নিজের চোখেই দেখছে। তবু মা'র অনুরোধ ঠেলে ফেলা যায় না।

মেয়ে বড়ো হয়েছে, কিন্তু বিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য নেই। ওর সমান বয়েসী মেয়েরা একে একে ভিন্ গাঁয়ে স্বামীর ঘর করতে চলে যাচ্ছে।

ওর চেয়েও ওর মা'র দুঃখ যে হৃদয়ের অনেক গভীরে সেকথা বুঝতে পারে কুসুম। তাই মা'র অনুরোধকে শুধুমাত্র অনুরোধ বলেই মনে হয় না। মনে হয়, এটা যেন ওর আকুল মিনতি। আর সেই কারণেই ইচ্ছে না থাকলেও শাড়ীটা কুসুমকে পরতে হয়।

ঘাটে এসে মেঘাইকে নজরে পড়তেই চমকে উঠেছিলো কুসুম। ওর পেশাল বুক, কালো অথচ সুগঠিত অবয়ব কুসুমের বুকের ভেতরে কাছে ডাকার কামনা উঁকি দিয়েছিলো। চারিদিকে তাকিয়েছিলো কুসুম। না, ও আর মেঘাই ছাড়া আর কেউ নেই ঘাটে। ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠেছিলো। একলা একটা পুরুষের এতো কাছাকাছি জীবনে আর কোনদিন দাঁড়ায় নি। বুকের ভেতরটা দুরু দুরু করে উঠেছিলো ; চেষ্টা করেও হাত পায়ের কাঁপুনিটা বন্ধ করতে পারে নি।

মেঘাইয়ের চাউনির ওপর নিজের দৃষ্টি পড়তেই লজ্জায় রক্তিম হয়ে ওঠে কুসুম। শাড়ীটা চারদিক থেকে টেনে এনে ভালো করে গায়ে-বুকে জড়ায়। রাগ হয় নারায়ণকাকার ওপর। নৌকো নিয়ে একবার ওপারে গেলে যেন আর ফিরতে চায় না।

নৌকোয় উঠে টের পায় কুসুম, গলুয়ের ওপর বসা দু'টো চোখ ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। সে চাউনিতে কোন কামনা নেই, আছে শুধু দেখার আনন্দ। সুভদ্রাকে সঙ্গে আনলে তবু এতোটা লজ্জায় পড়তে হ'তো না। নিদেন এই ঠোঁট-কুলুপ অবস্থা থেকে তো রেহাই পেতো।

জলের দিকে তাকিয়ে থেকেও মাঝে মাঝে দৃষ্টি তুলে দেখেছে কুসুম যে মানুষটা ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। কুসুম নিজেও এক-আধবার লুকিয়ে দেখেছে। কি যেন একটা আকর্ষণ ছড়িয়ে রয়েছে মানুষটার সর্বাঙ্গে, যা কুসুম দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেও ওর মনকে বেঁধে রেখেছে। শিবনিবাসের মাথার ওপরের আকাশে বেলাশেষ-রঙের ছোপ লেগেছে। তার চেয়েও বোধহয় বেশী রঙীন হয়ে উঠেছে কুসুমের দ্বিতীয় অন্তর। নারায়ণকাকার কথাবার্তায় বুঝেছে, আসান নগরের বিশ্বম্ভর সর্দারের ছেলে মেঘাই সর্দার হাটে এসেছিলো পাট

বিক্রী করতে। পাট বিক্রী করে পুজো সেরে বাড়ী যাবে।

ইচ্ছে করেই কুসুম মন্দিরের ভেতরে প্রয়োজনের থেকে বেশী সময় নিয়েছিলো। সারাদিনের উপবাসে ক্লান্ত সমস্ত মনপ্রাণ শুধু একটা প্রার্থনাতেই শিবলিঙ্গের সামনে ঢেলে দিয়েছিলো। অনেক বেশী সময় নিয়েছিলো কাঁচা দুধে শিবকে স্নান করাতে, তারচেয়েও বেশী সময় লেগেছিলো হৃদয়ের উপাচারে নৈবেদ্য সাজাতে। তারপর পুজো সেরে প্রসাদের থালা আর প্রসাদী ফুল হাতে নিয়ে একসময় মন্দির থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসেছিলো।

সন্ধ্যা না হলেও কৃষ্ণগঞ্জের আকাশে সন্ধ্যা নামবার তোড়জোড় সুরু হয়ে গেছে। বাড়ী গিয়ে তুলসীতলায় আবার প্রদীপ দেখাতে হবে, সন্ধ্যে দিতে হবে। সুতরাং ইচ্ছে থাকলেও মেঘাই পুজো সেরে মন্দির থেকে বেরোন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেনি।

বাড়ী ফিরেও ভুলতে পারে না কুসুম। কী একটা অনুভূতি যেন শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মনের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে আছে। নিজেকেই নিজে বেশ কয়েকবার কঠিন রাঙা চোখে শাসন করতে চেয়েছে। যার বাপের দু'বেলা ভালো করে দু'মুঠো খেতে দেবার সামর্থ্য নেই, তার কেন এ-স্বপ্ন দেখা? তবু পারে না। মন-নাও ওর অজ্ঞাতেই উজানে পাল তোলে। গ্রীষ্মের মাথাভাঙায় যেন হঠাৎ বর্ষণের ঢল নামে। একূল ওকূল দু'কূল ভাসিয়া নিতে চায়। কিছুতেই স্থির থাকতে দেয় না ওকে।

ঘরে ঢুকে সবাইকে প্রসাদ দেয়। তারপর শাড়ী বদলে তুলসীতলায় প্রদীপ দেখায়। গৃহদেবতাকে পুজো দিয়ে নিজে প্রসাদ মুখে দেয়। বাবা কোন্ এক ফাঁকে এসে খেয়ে হয়তো বা কোন বড়ো চাষীর কাছে ভাগের চাষের জমির জন্যে অথবা চণ্ডীমণ্ডপে গজল্লা করতে গেছে। ফিরতে রাত প্রথম প্রহর উত্‌রে যাবে। বাসনপত্র ধুয়ে কুসুম রান্নাঘরে ঢোকে। তাড়াতাড়ি রান্নাটা সেরে ফেলতে হবে। নইলে ভাইবোন-গুলো ঘুমিয়ে পড়লে ওদেব উঠিয়ে খাওয়ানো এক ঝামেলা। রোজই সন্ধ্যের আগে উনুনে আগুন দিয়ে ঘরের অন্যান্য টুকিটাকি কাজগুলো সেরে নেয়। তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে, গৃহদেবতার পুজো সেরে রান্না

চাপিয়ে দেয়! প্রথম সন্ধ্যাতেই রান্না নামিয়ে ছোট ভাইবোনদের ঘুমিয়ে পড়ার আগে খাইয়ে দেয়। তারপর মা'কে খাইয়ে বাবার আর নিজের ভাত ঢাকা দিয়ে রেখে সেলাই নিয়ে বসে। আর যখন নয়নলতা অথবা ইন্দুমতী আসে, তখন ওদের বাড়ীতে গিয়ে গাল গল্পে সন্ধ্যেটা কাটায়। তারপর বাবা বাড়ী ফিরলে তাকে খেতে দিয়ে নিজে খেয়ে শুতে শুতে রাত গভীর হয়ে যায়।

উনোনে আগুন দিয়ে সুভদ্রাকে ঘুম পাড়ায় কুসুম। মেয়েটা জেগে থাকলে ওকে একটুও কাজ করতে দেবে না। একেই দেরী হয়ে গেছে। সুভদ্রা ঘুমিয়ে পড়লে মার পাশে ওকে শুইয়ে রেখে রান্নাঘরে আসে। উনোন ধরে গেছে। রান্নার জোগাড় সেরে কুসুম উনোনের পাশে এসে বসে।

মনটাকে কিছুতেই আজ একটা বিন্দুতে স্থির রাখতে পারে না। অস্থির মনে অনেক আকাংখার ঢেউ ওঠে। নানা রঙিন আশার স্বপ্ন জাগে। চেষ্টা করেও কিছুতেই মনের আয়না থেকে সেই চাউনি মুছে ফেলতে পারে না।

সেই দৃষ্টি, পেশাল বুক, সুঠাম অবয়ব—যে কোন মেয়ের সুনিশ্চিত আশ্রয়স্থল। ঝড় ঝঞ্ঝায় বিক্ষুব্ধ এই সংসার—সমুদ্রে সবচেয়ে নির্ভরশীল বন্দর যেন এই বুক, সেই চাউনি। কিন্তু কুসুম কি তার যোগ্য? ওর কি আছে দেবার মতো? রূপ? চরকের মেলায় একবার কৃষ্ণনগরে গিয়েছিলো। দেখেছিলো ওর থেকেও অনেক রূপসী মেয়ে আছে এই পৃথিবীতে। তবে? তবে কি দেখে ওকে পছন্দ হবে মেঘাইয়ের, আর কুসুমই বা ওকে কী দিতে পারবে?

এক একবার মনে হয় কি হবে এসব ভেবে। যার কথা ও ভাবছে, সে কি এতোক্ষণ ওকে মনে রেখেছে? তবে কেন মিছিমিছি কুসুম এতো ভেবে মরছে? অসমর্থ পিতা, অসুস্থা মা আর কতোগুলো ছোট ছোট ভাইবোন—এর মাঝে কুসুমের স্বপ্ন কি করে সার্থক হবে? আশার কুঁড়িতে ফুল ফুটবে? তবু কুমারী মন স্বপ্ন দেখে। আশার উজ্জ্বল আলোয় সন্ধ্যার অন্ধকার আকাশটাকে রাঙাতে চায়।

॥ চার ॥

পরপর কয়েকটা পাল্‌কি এসে থামে ওদের বাড়ীর দাওয়ায়। ঘরের মেয়েরা শঙ্খধ্বনি করে। কুসুম বোঝে বর এবং বরযাত্রীরা এসে গেছে। বুকের ভেতরে অজানা আশংকায় এবং আনন্দে কেমন যেন একটা কাঁপন ধরে। হঠাৎ সন্ধ্যায় আলোছায়ার সঙ্গমে দেখা মানুষটা ওর জীবনে কী রূপে আসবে? সেই বিরাট বুকে জুটবে তো ওর সারা জীবনের নিরাপদ আশ্রয়! নাকি—। বাকিটা আর ভাবতে পারেনা কুসুম। চায়ও না।

কামিনীর কথা মনে পড়ে। গাঁয়ের সেরা সুন্দরী। এক ডাকে চার চারটে গ্রামের লোক চেনে। সেই মেয়েও বিয়ের পর কুসুমের কাছে কতো দুঃখ করেছে, হা-হুতাশ করেছে। কুসুম বুঝিয়েছে, কিন্তু কামিনীর চোখের জল তা'তে কমে নি। বরং ওর সহানুভূতিতে আরো যেন কান্নায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। সত্যি তো, কী দিয়েই বা কামিনী নিজেকে বোঝাবে?

রূপ না থাকলে তবু না হয় কথা ছিলো। এক এক সময় কুসুমও ভেবেছে, কামিনীর স্বামী কি চায়? ঘরের কোণে এই পাগল-করা রূপ ফেলে দিয়ে কেন ও পাগলের মতো কেষ্টনগরের কমদতলীর ঘাটে অথবা কাল্‌নায় ছোটো। কি পেয়েছে পুরুষটা সেই মেয়েমানুষগুলোর ভেতরে? আর কী-ই বা তাকে দিতে পারে নি কামিনী? ছেলেপুলে? সে তো বছর ভালো করে ঘুরতে না ঘুরতেই ওর কোলে এসেছে। তবুও তা'তে রূপের এতোটুকু ঘাট্‌তি পড়ে নি। বরং স্বামীর অবহেলার অপমানে আর ভালোবাসার বঞ্চনায় দিনের পর দিন তা' যেন বেড়ে চলেছে। সে কি রঙীন বনফুলের মতোই অনাদরে আর নীরবে ঝরে পড়ার জন্যে? এতো সুন্দরী স্ত্রী ঘরে থাকতেও ওর স্বামী রাতের পর রাত কাটায় বাইরের মেয়েগুলোর সঙ্গে। শেষ প্রহরে মাতাল হয়ে বাড়ী ফেরে। মারধোর করে কামিনীকে। শুধু যেন সন্তানের জন্ম দিতেই

কামিনীকে বিয়ে করেছে, সংসারে এনেছে। তার বেশী কিছু চাইবার অধিকার যেন কামিনীর নেই ; ওর স্বামীরও যেন এর বেশী কিছু দেবার দায় দায়িত্ব নেই। সারারাত মেয়েমানুষগুলোর সঙ্গে কাটিয়ে একরাশ ছাইপাঁশ গিলে তারপর ও ঘরে এসে আবার কামিনীর শাড়ীর আঁচল ধরে টানাটানি করে। ভাবতেও কুসুমের নিজের শরীরই ঘৃণায় রি-রি করে ওঠে।

জোর করেই হঠাৎ-আসা কামিনীর চিন্তাটা মাথা থেকে সরায় কুসুম। আজকের এই শুভক্ষণে অশুভ কোন চিন্তা মনের ভেতরে আনতে নেই। তা'তে নিজেরই অমঙ্গল। আর সব পুরুষই তো কামিনীর স্বামীর মতো নয়। ইন্দুমতী তো বলে ওকে ছাড়া ওর স্বামীর একটা রাতও নাকি ঘুম হয় না। আঁতুড় পড়তে ওকে বাপের বাড়ী আসতেও দেয় না। সেও তো পুরুষ।

পাল্‌কি থেকে বর এখনো নামানো হয় নি। বরণ শেষ করে তবে নামানো হবে। এক একবার ইচ্ছে যায় ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখতে। পরমুহূর্তেই কৌতূহলী মনটাকে জোর হাতে শাসন করে কুসুম। শুভদৃষ্টির আগে মুখ দেখতে নেই। তবু এখনো চোখের সামনে ভেসে ওঠে শিবনিবাসের ঘাটের মুহূর্তগুলো। পরদিন সন্ধ্যের ঝোঁকেই এসেছিলো বিশ্বম্ভর সর্দার। বাবাকে ডাকছে শুনে বাড়ীতে পুরুষ কেউ না থাকায় ওকেই এগিয়ে যেতে হয়েছিলো।

কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বিশ্বম্ভর বলেছিলো,—এটা পরেশ নায়েকের বাড়ী ?

কুসুম মাথা নেড়ে উত্তর দিয়েছিলো,—হ্যাঁ। তারপর বলেছিলো,—কিন্তু বাবা তো এখন বাড়ীতে নেই। চণ্ডীমণ্ডপে গেছেন।

গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে যাবার পথটা ওর কাছ থেকে জেনে নিয়ে বিশ্বম্ভর চলে গিয়েছিলো। কুসুম তখন ভাবতে পারে নি, তা'হলে কখনই এতো কাছে যেতো না। পারতো না কথা বলতে। ভেবেছিলো কোন ভিন্‌ গাঁয়ের মহাজন বাবাকে দিয়ে কাজ করাতে এসেছে। তবে সন্ধ্যেবেলা মা'কে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে ওর বাবা যখন আনন্দে জোরে জোরে মা'কে বলেছে,—কিগো, তোমার মেয়ের জন্যে আমি

নাকি চিন্তা করি না? আজ তো আসন নগরের বিশ্বম্ভর সর্দার এসেছিলো। ওর নওজোয়ান ছেলে মেঘাইয়ের জন্য কুসুমকে চাইলো। তা' আমিও এককথায় রাজী হয়ে গেলাম। এমন জামাই আর কোথায় পাবো?

কথাগুলো বলে থেমেছিলো বাবা। মা'র আনন্দ পাশের ঘর থেকেও টের পেয়েছিলো কুসুম। খুসীও হয়েছিলো মনে মনে। কয়েক মুহূর্তের ভালো-লাগা যে সারাজীবনের ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসবে—একথাটা ভাবতেও উদ্বেল হয়ে উঠেছিলো কুসুম।

মা বাবাকে বলেছিলো,—কুসুমের যে অমন ঘর-বর হবে তা' আমি আগে থেকেই জানতাম। মেয়ে তো আর আমার দেখতে খারাপ নয়।

সে রাতের মতো সুন্দর রাত ওর জীবনে আর আসে নি। ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সেদিনের সেই লালপেড়ে শাড়ীটা পরে অনেকক্ষণ বসেছিলো। বেড়ার ফাঁকে গোঁজা কাঁচের টুক্‌রোটায় বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখেছিলো। তারপর রাতের বিছানায় সমস্ত অনুভূতিগুলোকে সারা রাত জেগে জেগে স্পর্শ করেছিলো। স্বপ্ন দেখেছিলো বিভোর হয়ে।

এরপর বাবা সময় পেলেই ওকে কাছে ডাকতো। গায়ে মাথায় হাত বুলোত। মা জোর করে ওকে ঘরের কোন কাজ করতে দিতো না। হয়তো বা এতোদিনের অবহেলা পরের ঘরে যাবার প্রাক্‌কালে সুদে আসলে পুরণ করে দিতে চাইতো। আর বাড়ীর ব্যবহারের এই হঠাৎ পরিবর্তনই যেন ওকে প্রতিটি মুহূর্ত স্মরণ করিয়ে দিতো যে ও পরের ঘরে যাচ্ছে। যার ঘরে ও পা রাখতে যাচ্ছে, তার নিশ্চয়ই ওকে ভালো লেগেছে। তাই তো ওকে সাদরে বরণ করেছে। তবে মাঝে মাঝে অজানা আশংকার সূচ মনের মধ্যে বেঁধে। চোখের ভালো লাগা আর মনের ভালোবাসা কি এক? প্রথমটাতে তো থাকে কামনা আর দ্বিতীয়টাতে অন্তরের কামনাহীন ব্যাকুলতা। যদি কুসুম না পারে সমস্ত রকম দাবী মেটাতে? তবে? তখন কী হবে?

পরমুহূর্তেই আরেকটা আশ্বাস মনে ঢেউ তোলে। কেন পারবে

না ও নিজেকে তার কাছে সম্পূর্ণ সঁপে দিতে। আশা-আকাংখা, কামনা-বাসনা, সুখ-দুঃখ, সব মিলিয়ে মিশিয়েই তো একটা মানুষ, তখন যেমন করেই হোক্ কুসুমকে তা পূরণ করতেই হবে। নইলে মেয়ে হয়ে জন্মেছে কেন ?

বাইরে মঙ্গলশঙ্খ বাজে। কুসুম বুঝতে পারে, বরকে পাল্কি থেকে নামিয়ে বরণ করা হচ্ছে।

ইন্দুমতী এসে ঘরে ঢোকে। সকাল থেকেই ইন্দুমতী ওর সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। সূর্যের আলো ফোটার আগে মাথাভাঙায় জল ভরতে গেছে। ওকে ক্ষার দিয়ে স্নান করিয়েছে। চুল শুকিয়ে দিয়েছে। যত্ন করে আলতা পরিয়েছে; আর এলোমেলো গল্প করেছে নিজের স্বামী-সংসারের, শ্বশুরবাড়ীর, বিয়ের দিনগুলোর। ইন্দুমতীর অবশ্য বেশ ছোটবেলাতেই বিয়ে হয়েছে। বাবা পাটের মহাজন, তার ওপর সুদের কারবারী। সুতরাং অবস্থাপন্ন ঘরে-বরেই পড়েছে।

ওকে ঢুকতে দেখে কুসুম হেসে ফেলে। ইন্দু ওর পাশে এসে বসে। তারপর কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে ফিস্‌ফিস্ করে বলে,—কুসুম, তুই সত্যি ভাগ্যবতী, রূপে গুণে যাকে বলে একেবারে কার্তিক।

—যাঃ, তোর সবেতেই হাসি ঠাট্টা।

ওর কপট লজ্জায় হেসে ফেলে ইন্দুমতী। তারপর উঠে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে চন্দনের পাটাটা এনে চন্দন ঘষে। কুসুমকে চন্দনের ফোঁটায় সাজায়। কপালের মাঝখানে রক্ত-চন্দনের টিপ এঁকে দেয়। পায়ে নতুন আলতা পরায়। চুলগুলো পেছনে টেনে সুন্দর একটা হাত-কবরী বাঁধে। তারপর বলে, কিরে সই, এই ভরা ফাগুনেও যে দেখছি ঘেমে উঠেছিস্!

—ইন্দু, তুই কিন্তু ভীষণ অসভ্য হয়েছিস্।

—তা তো বলবিই। আমি বলি, বাড়ীর সবাই যে বর-বর করে মেতে উঠেছে, আমাদের মেয়েটাই বা কম যায় কিসে? ঘরের মানুষ, তাই এদিকে তো আর কারোর নজর পড়েনি, নইলে—। বাকীটা উহ্য রেখেই ইন্দুমতী এগিয়ে এসে কুসুমের গাল দু'টো নিজের হাতের মধ্যে

নিয়ে নিজের গালের সঙ্গে ঘষে দেয়।

—স্বামীর আদর তো জীবনভর খাবি, তাই আগে আমি একটু আদর করে নিলাম।

কুসুম লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। মুখে বাধা দিলেও অন্তর আশায় আশায় ভরে ওঠে। সত্যি যদি ওর স্বামী সারাটা জীবন এমনি আদরে আদরে ভরে দেয়। ছোট্ট গৃহকোণ, কালো কালো কোল- ভরা ছেলেমেয়ে আর শান্ত, নিরীহ অথচ ব্যক্তিত্বে পরিপূর্ণ একজন পুরুষ। একটা মেয়ের জীবনে এর চেয়ে বেশী চাওয়া আর কি থাকতে পারে?

ছাঁদনাতলায় বর পৌঁছে গেছে। ইন্দুমতী ছুটেছে। মেয়েটাকে বড়ো ভালো লাগে কুসুমের। একটা হাতে সেই কাক-সকাল থেকে সবকিছু করে চলেছে। কুসুমকে সাজানো, স্নান করানো, মেয়ে চলে যাবার আসন্ন বেদনায় ভেঙে পরা মা'কে বোঝানো।

কথাবার্তায় বুঝতে পারে ওরা এখনই ওকে ছাঁদনাতলায় নিয়ে যাবে। কুসুম আন্দাজেই ঘোমটাটা আরো একটু বেশী করে টেনে দেয়।

পিঁড়েতে করে ওকে তুলে সবাই মিলে ঘর থেকে ছাঁদনাতলায় নিয়ে আসে। বর ওর মুখোমুখি আসনে বসে রয়েছে। ওদের দু'জনার মাঝখানে নামাবলী গায়ে পুরোহিত আর ওর পাশে দূর সম্পর্কের অবনীকাকা। সম্প্রদান করবে।

পুরোহিত একমনে উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্র পড়ে চলেছে। সামনের আসনে চুপচাপ মেঘাই বসে। পরিবেশটাকেই কেমন গম্ভীর করে তুলেছে।

সম্প্রদান শেষ করে অবনীকাকা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। পুরোহিত শুভদৃষ্টির মন্ত্র বলে। এবার ইন্দুমতী, নয়নলতা প্রভৃতি মেয়েদের পালা। ওর আর মেঘাইয়ের মাথার ওপর পাতলা একটা মুর্শিদাবাদীকাপড় ঢাকা দেওয়া হয়েছে। একবার ভেবেছিলো, ওর শুভদৃষ্টি তো হয়েছে সেই প্রাক্‌সন্ধ্যার শিবনিবাসের ঘাটের মুহূর্ত-গুলোতে। জলের আয়নায় পরস্পর পরস্পরকে দেখেছে। দোঁহায় চিনেছে দুঁহুকে, তবু সবার পীড়াপীড়িতে দৃষ্টি তুলে তাকাতে হয়।

আর দৃষ্টি তুলেই সেই মুহূর্তে নামিয়ে নেয়। একজোড়া স্বচ্ছ নির্মল চোখ ওর দিকে তাকিয়ে আছে। অবাক হয়ে ওকে দখছে। সেই দৃষ্টিতে রয়েছে আশ্বাস, আছে আশ্রয়।

বরযাত্রীরা বিয়ের আগেই খেয়ে নিয়েছে। একে গ্রামের পথ, তায় আঁধার রাত। বিয়ে শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট দল বেঁধে গ্রামে ফিরে গেছে। পথ তো কম দূরের নয়। কেউ যাবে আসান নগর অথবা ভীমপুর বা চৌগাছা। আর কেউ কেউ আরো দূরে সদর সহর কেষ্টনগরে।

বর-কনেকে ঘরে তুলে দিয়ে নয়নলতা, ইন্দুমতী এবং পরিবারের অন্যান্য মেয়েরাও চলে গেছে। ভয়ে বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করে ওঠে। এতোক্ষণ না হয় চারিদিকে এতোগুলো মানুষ ওদের ঘিরে ছিলো, এবার ও সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা পুরুষের মুখোমুখি। একেবারে একলা। ছাদনাতলায় কুশণ্ডিকার সিঁদুরে ওর সীমন্ত রাঙা করে না হয় সবচেয়ে কাছের সম্পর্ক হয়েছে, তবু পরিচিত তো নয়। ঘরে ঢোকার আগে কুসুম লজ্জাতুর হাতে ঘোমটাটা টেনে আরো নামিয়ে দিয়েছিলো। নয়নলতা যদিও দুষ্টুমি করে ওটা প্রায় তুলে দিয়েছে, তবু চোখ তুলে তাকাবার সাহস হয় নি কুসুমের। লুকিয়ে চুরিয়ে অবশ্য বেশ কয়েকবার এর মধ্যেই মেঘাইকে দেখেছে। শান্তিপুরী ধুতি, মটকার পাঞ্জাবী আর চন্দনে মানুষটাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। এইরকম একটা পুরুষই যেন মনে মনে ও কামনা করে এসেছে। এরজন্যই প্রতি শিবচতুর্দশীতে শিবনিবাসের মন্দিরে লিঙ্গের মাথায় কাঁচা দুধ ঢেলেছে।

এতোক্ষণের কোলাহলমুখর বাড়ীটা নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। অতিথিরা উৎসব-পর্ব শেষ হ'তেই যে যার বিদায় নিয়েছে।

বাড়ীর লোকেরা কাজকর্মের শেষে ঘরে ঢুকে ঘুমোবার উদ্‌যোগ করছে। কে যেন একটা নির্জনতার চাদরে সমস্ত উৎসব বাড়ীটাকে ঢেকে দিয়েছে। সকাল থেকে কাজের চাপে সবাই ক্লান্ত, কুসুম নিজেও ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছে। সারাদিন উপবাস, তায় উৎকণ্ঠা এবং উদ্বেগ তো কম নয়। বিয়ের শেষে সারাদিনের অনাহারী শরীরে এবং সম্পূর্ণ একটা অপরিচিত পুরুষের সামনে খাওয়াও হয়ে ওঠে নি। আর দু'

আর দু'একটা মিষ্টি যা নয়নলতা, ইন্দুমতী জোর করে মুখে গুঁজে দিয়েছে তা'তে যেন গা-টা আরো গোলাচ্ছে। ঘরের অন্য মানুষটাও নিশ্চয়ই ক্লান্ত ; তার ওপর দিয়েও তো কম ধকল যায় নি।

কুসুম এককোণে জড়োসড়ো হয়ে বসেছে। মেঘাই এগিয়ে এসে কুসুমের পিঠে একটা হাত রাখে ; লজ্জায় ও যেন আরো সংকুচিত হয়ে আসে। নতুন পুরুষের প্রথম স্পর্শে শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় একটা রোমাঞ্চ পাক খেয়ে যায়।

মুখটা দু'হাতে ওর দিকে তুলে ধরে মেঘাই কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ওকে নিরীক্ষণ করে। তারপর বলে,—শিবনিবাসের ঘাটের কথা তোমার মনে আছে ? সেইদিন ফিরে গিয়েই আমি মা'কে বলেছিলাম।

লজ্জায় কুসুম এ কথার কোন উত্তর দিতে পারে না। শুধু কৃতজ্ঞতায় দৃষ্টি নামায়।

—আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে ?

মেঘাইয়ের এ প্রশ্নে চিৎকার করে উত্তর দিতে ইচ্ছে যায়। ইচ্ছে হয় মন খুলে বলতে,—আমার এতো ভাগ্য। তবু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। লজ্জাটা গলার স্বর বুজিয়ে দিয়েছে। শুধু মাথা নেড়ে জানায়, হ্যাঁ।

ওর উত্তরে মেঘাই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। ওকে আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে বলে, জানো এতোদিন যাত্রায় কৃষ্ণের পার্ট করেছি, এবার কিন্তু সত্যি রাধা পেলাম।

কথা ক'টা শেষ করে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ওঠে। আলোটা নিভিয়ে দেয়।

সংকোচে আর লজ্জায় একেবারে বিছানার একটা ধার ঘেঁসে শোয় কুসুম। অন্ধকারে মেঘাইয়ের মুখ দেখা যায় না। ঘরের কোণে জ্বলছে পঞ্চপ্রদীপ। তারই কয়েকটা রশ্মি প্রলম্ব হযে পড়েছে ঘরের দেওয়ালে।

ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে এলেও ঘুম আসে না। মেঘাইয়ের পেশাল বুকের উষ্ণ আলিঙ্গনে সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ বয়ে আনে। এক

সময় কুসুম নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দেয় ওর বুকে।

সারাটা রাত ওকে আদরে সোহাগে ভরিয়ে দিয়ে মেঘাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে এলেও কুসুম ঘুমোতে পারে না। মাঝে মাঝে উঠে পঞ্চপ্রদীপ দেখতে হয়েছে। তেল দিয়ে প্রদীপের সল্‌তে উসকে দিয়েছে।

মেঘাই অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কুসুম কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে ওর ঘুমন্ত মুখটা নিরীক্ষণ করে। শান্ত, নরম কোমলতায় পরিপূর্ণ। চুলগুলো অবিন্যস্ত।

নতুন সীমন্তের সিঁদুরে কুসুমের সারা মুখ মাখামাখি হয়ে গেছে, শাড়ী বিস্রস্ত। শাড়ীটা গুছিয়ে দরজা খুলে বাইরে আসে কুসুম। রাত ফর্সা হয় নি। অন্ধকারের পাতলা একটা চাদর আকাশ আর পৃথিবীর গায়ে এখানে-ওখানে লেগে রয়েছে। বিয়ে বাড়ীর অনেকেই রাত থাকতে উঠে পড়েছে। ইন্দুমতী, নয়নলতা বাড়ী ফিরে যায় নি। ফুলশয্যা তুলে তবে বাড়ী যাবে।

ওকে ঘর থেকে বেরোতে দেখে ইন্দুমতী, নয়নলতা এগিয়ে আসে। ভালো করে দেখে। তার পর বলে,—রাতে ঘুম হয়েছিলো সই, নাকি শুধু গল্প ?

—এই চুপ কর। এখনো ঘুমোচ্ছে। ঠোঁটের ওপর আঙ্গুল রেখে কুসুম ইন্দুমতীকে বলে।

ওর কথায় এক টুক্‌রো মুচকে হেসে নয়নলতা টিপ্পনী কাটে,— এক রাতেই এতো দরদ !

ওদের সঙ্গে কুসুম পাশের ঘরে আসে। এখনো বাড়ীর লোকজন ঘুম থেকে ওঠে নি। গত কালের ধকলের পর সবাই আজ ক্লান্ত। তার ওপর কাজ তো আর কম পড়ে নেই। বর-কনে তোলা, বাসী বিয়ের জোগাড় করা। সন্ধ্যের আগেই বরপক্ষের লোকজন আসবে বর-কনেকে নিতে। বিয়ে বাড়ীতে কী কাজের শেষ আছে ? একটা ফুরোতে না ফুরোতেই হাতের কাছে তিনটে এসে জড়ো হয়।

পাশের ঘরে কুসুম এসে বসলে নয়নলতা ওর চুল খুলে দেয়।

বিয়ের শাড়ী প্রথম বছর জলে ভিজোতে নেই। সুতরাং শাড়ী বদলে ঘাটে যেতে যেতে শেষ রাতের হাল্‌কা আঁধার সরে গিয়ে ভোরের আলো হাজিরা দেবার তোড়-জোড় সুরু করে দিয়েছে। স্নান সেরে এলে ওরা ওকে সাজাতে বসে। কুমারী জীবনের রঙিন অথবা গতরাতের বিয়ের কনের উজ্জ্বল সাজ নয়। আজ ও বধূ। আরেকজনের ঘরণী। একটা সংসারের সম্পূর্ণ না হোক্, অনেকটা দায়িত্বই ওর ওপর।

এক একবার ভাবতে গিয়ে নিজেরই অবাক লাগে। একটা রাত, মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা একটা মেয়ের জীবনে কতো পরিবর্তন নিয়ে আসে। সেদিনের সেই মেয়েটাকে, তার মনটাকে যেন অনেক চেষ্টা করেও আর খুঁজে পাওয়া যায় না। হারিয়ে গেছে, মুছে গেছে ওর কুমারী জীবনের চপলতা। অরেকটা মানুষের সারা জীবনের সুখ-শান্তি নির্ভর করছে ওর ওপর। ওর ছায়ায় সে শান্তি পাবে। মুখের হাসিতে মুছে দিতে হবে দৈনন্দিন ছোট ছোট দুঃখ-বেদনার টুক্‌রোগুলো।

ওর সাজগোজ হ'তে হ'তে মেঘাই উঠে পড়েছে। ইতিমধ্যে আসান নগর থেকেও বরপক্ষের লোকজন এসে গেছে। সূর্য ওঠার কিছু পরেই আবার বাসী বিয়ের অনুষ্ঠান সুরু হবে। গতকাল রাত্রে গাঁটছড়া বাঁধা হয়েছে, দশ মঙ্গলায় তা, খোলা হলেও তা' অলক্ষ্যে বাঁধা থাকবে দু'জনের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায়।

সাজগোজ সেরে ইন্দু আর নয়নকে সঙ্গে নিয়ে মেঘাইয়ের ঘরে ঢোকে। এক ঝলক তাকায় মানুষটার দিকে। রাতের বিশ্রামের পর মানুষটা হাসিখুসিতে উজ্জ্বল।

গ্রামের বয়স্কা বৌ, সমবয়সী মেয়েরা বাসী বিয়ের জন্য ইতিমধ্যে এসে গেছে।

বাসী বিয়ে শেষ হয়ে স্নান-খাওয়া সারতে সারতেই বেলা গড়িয়ে যায়। উৎসবের বাড়ী, ইচ্ছে থাকলেও সবকিছু সময় মতো হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। এদিকে সন্ধ্যের আগেই বর-কনেকে আসান নগরে রওনা করিয়ে দিতে হবে।

দধি-মঙ্গলের পর থেকেই কুসুমের মনটা কেমন ভারী হয়ে ওঠে। হৃদয়ের অন্তঃস্থলে কান্নার আভাস জাগে। এতোক্ষণ পর্যন্ত হঠাৎ সন্ধ্যায় দেখা মানুষটার সঙ্গে মিলনের আশা ওকে ভরিয়ে রেখেছিলো। নতুন জীবন; নিজের সংসার। তার সুর এবং স্বাদে সব কিছুকেই ভালো লেগেছিলো। তাকে ঘিরেই রঙ-বেরঙের স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু সে স্বপ্ন যখন বাস্তবে ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে, তখন তার প্রতি অতীতে যে মোহ ছিলো সেটা কেটে গেছে—এসেছে নতুন আরেক চিন্তা।

ঘর বাঁধাই তো শেষ নয়, বরং সুরু। আর কিছুক্ষণ বাদেই এই এতোদিনের পরিচিত জগতটাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। বাপ্-মা, ভাই-বোন, পরিচিত সবাইকে। অন্য আরেকটা পুরুষের ইচ্ছের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিয়ে চলতে হবে জীবনের আগামী পথ। কেমন সে পথ কুসুম তা' জানে না। হয়তো বা উঁচু-নিচু বন্ধুর নয়তো বা মসৃণ। যাই হোক্ তাকেই অবলম্বন করে আগামী পথ চলতে হবে।

আসাননগর থেকে পালকি অনেকক্ষণ এসে গেছে। বর-কনেকে নিতে। সন্ধ্যের ঘোর লাগার আগেই আসাননগরে পৌঁছনো চাই। পথও কম নয়। প্রায় আট ন' ক্রোশ। তার ওপর গাঁয়ের পথ। নতুন বর-কনে। বিয়ের জিনিষপত্রও সঙ্গে রয়েছে। সুতরাং বিপদ-আপদ হ'তে কতোক্ষণ।

কুসুম একে একে মা বাবা আর বাড়ীর গুরুজনদের প্রণাম করে। ছোট ছোট ভাইবোনদের কাছে ডেকে আদর করে। ইন্দুমতী, নয়নলতা প্রভৃতি সইদের কাছ থেকে বিদায় নেয়।

মনটা কেঁদে ওঠে। এতোদিনের পরিচিত পরিবেশের মায়া যেন পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরতে চায়। তবু ওকে সব মায়া ছেড়ে যেতে হবে। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। এই ঘর, এই বাড়ী—একটা রাতে সবকিছুর ওপর থেকে ওর দাবী চলে গেছে। আর কোন দিনই পুরোনো দিনের দাবী নিয়ে এখানে এসে দাঁড়াতে পারবে না। এবার আসতে হবে অতিথি হিসেবে। এদের একজন আর

ও নয়। ভাবতেই মনটা হু-হু করে কেঁদে ওঠে। তবু যেতে হবে। এ-সংসার তো আর ওর নিজের নয়। মেয়েদের জন্মের প্রথম প্রভাতেই ওদের নিজেদের সংসার ঠিক করা থাকে। সে সংসার বরণ করুক আর না-ই করুক, আপন মমতায় তাকে আপনার করে নিতেই হবে।

পাল্‌কিতে উঠে নিজেকে অসহায় আর একাকী বলে মনে হয়। যতোক্ষণ দেখা যায় দরজাটা একটু ফাঁক করে রাখে।

মা ছাড়া সবাই সদর রাস্তা পর্যন্ত পাল্‌কির সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। তারপর ওরা ফিরে যেতেই মনটা আরো বেশী শূন্যতায় ভরে উঠেছে।

পরিবেশটাকে সহজ এবং লঘু করার জন্য মেঘাই বলে,—তোমার ভয় করছে?

কুসুম বাঁ হাতে ঘোমটাটা আরো একটু নীচে নামিয়ে দিয়ে মাথা নেড়ে উত্তর দেয়,—না। তুমিই তো আছো।

পাল্‌কি চৌ-গাছা, ভীমপুর পেরিয়ে আসান নগরে ঢুকতে ঢুকতে সূর্য পশ্চিমে অস্ত যায়। নতুন একটা অনুভূতিতে কুসুমের সমস্ত মন ভরে ওঠে। এতোটা পথ মেঘাইয়ের মুখোমুখি বসে নিজেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে নিয়েছে। যে রকম পরিস্থিতির সামনে গিয়েই পড়তে হোক না কেন, তার মোকাবিলা ও করবে। ওর লক্ষ্য হবে নির্দিষ্ট একটা স্থির বিন্দু; সামনের মানুষটাকে খুশী করা।

মেঘাইদের উঠোনে পাল্‌কি নামতেই সবাই এসে ঘিরে ধরে। পাড়া-পড়শী, বৌ-ঝিরা এসেছে নতুন বৌ দেখতে। কুসুম লজ্জায় রক্তিম হয়ে ওঠে। এতোগুলো অপরিচিত মানুষের সামনে বসে সংকোচে ঘামতে থাকে।

বাড়ীর মেয়েরা ইতিমধ্যে পঞ্চপ্রদীপ, বরণডালা নিয়ে এসে বধূবরণ করে ওকে পাল্‌কি থেকে নামায়। ঘরে তোলে।

মেঘাই বন্ধুদের সঙ্গে বাইরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে গল্প করছে।

পাড়ার মেয়েরা ওকে ঘিরে ধরেছে ইতিমধ্যে। নানা রকম প্রশ্ন করছে। নতুন পরিবেশে কিছুটা অস্বস্তি বোধ হয়। তবু যে করেই হোক, এদের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে।

॥ পাঁচ ॥

প্রথমে ক'দিন অসুবিধে হয়েছিলো। কিন্তু ধীরে ধীরে সেসব সড়গড় হয়ে গেছে। অবশ্যকোন ননদ অথবা ভাসুর-ঝি থাকলে এতোটা অসুবিধে হ'তো না। কিন্তু সংসারে মেয়েছেলে বলতে তো একমাত্র মেঘাইয়ের মা আর কুসুম। তবে ইতিমধ্যে ওর বয়সী পাড়ার বৌদের সঙ্গে ভাবসাব হয়ে গেছে। মেঘাইয়ের বন্ধু গণপতি, নটবরের বৌদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে।

কুসুমের বেশ ভালো লাগে এ সংসারটাকে। বাবা পরেশ নায়েকের তো চালচুলো কিছুই ছিলো না। ফসলের সময় ভাগে যা জুটতো, তা'তে বছরের কয়েকটা মাসও ভালো ভাবে চলতো না। আর তারপরেই পুরোটা বছর হয় অর্ধাহার না হয় উপবাস। অভাবের সংসার, ছুতোনাতায় ঝগড়া-ঝাঁটি লেগেই থাকতো। আর এরা জমিদার না হোক্, বড়ো চাষী তো বটে। স্বাচ্ছল্যে ভরা সংসার। অভাবের ছিটেফোঁটাও কোথাও নেই। ধান যা হয়, সারা বছরের খোরাকী হয়েও কোন কোন বারে বিক্রী করে। আর বিঘের পর বিঘে জুড়ে জমিতে হয় পাট।

জমি থেকে পাট ওঠা মানেই লক্ষ্মী ঘরে আসা। আর স্বাচ্ছল্য মানেই উৎসব। তাই নবান্ন, পৌষালী প্রভৃতি ছোট বড়ো পাল পার্বণ সম্বৎসর লেগেই আছে। পাট বিক্রীর টাকায় সংসারের জিনিষপত্র এনেও মেঘাই প্রতি হাটবারে কুসুমের জন্য কিছু না কিছু আনে। কোলকাতা থেকে আনা কলে বোনা চুলের ফিতে, রঙীন রেশমী চুড়ি, অথবা শান্তিপুরের হাতে বোনা তাঁতের শাড়ী।

হাটের শেষে ও যখন বাড়ী ফেরে, কুসুম তখন মা'র সঙ্গে রান্নাঘরে ব্যস্ত। ওর সাড়া পেলে হাত-পা ধোয়ার জল আর খাবার দিতে সরে যায়। ইচ্ছে থাকলেও হাটের খবর জিজ্ঞাসা করতে পারে না। লজ্জা

পায়। দিনমানে সোয়ামীর সঙ্গে কথা বলতে দেখলে লোকে কী বলবে! বেহায়া।

স্বামীর আদর সোহাগ, শ্বশুর-শাশুড়িকে সেবাযত্ন, ধান ভানা, রান্নাবান্না গোয়ালঘরের কাজ আর দুপুরবেলা অবসর সময়টা পাড়ার বৌ-ঝিদের সঙ্গে গল্পে দিনগুলো ভালই কাটে কুসুমের। আগের মতো নিজেকে আর অতোটা একলা মনে হয় না। মেঘাইও নিজেকে সংসারে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়েছে।

বাবা বিশ্বম্ভরের বয়েস হয়েছে। এই বয়েসে জমিতে মুনীষ খাটানো, চাষের পেছনে লেগে থাকা, কেষ্টনগরের সরকারী খাজাঞ্চীখানায় ছোটা-ছুটি করে খাজনা দেওয়া আর পেরে উঠে না। মেঘাই-ই একহাতে এগুলো সব তুলে নিয়েছে। সকালেই জমিতে বেরিয়ে যায় আর ফেরে মুনীষদের সঙ্গে। সন্ধ্যার ঝোঁকে। জমির পেছনে না লেগে থাকলে কি আর জমির লক্ষ্মী ঘরে ওঠে। লক্ষ্মী তো অচলা নয়, সচলা। জমিকে অবহেলা করলে অন্যের জমিতে গিয়ে উঠবে। তার ওপর আবার মামলা-মোকর্দমা, জমিদারের নায়েব-পেয়াদাদের মন রাখা তো আছেই। এতো সব ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে সময় বড়ো একটা পেয়ে ওঠে না।

বিয়ের পর প্রথমদিকে মাঝে মাঝে কুসুম বাপের বাড়ী কেষ্টগঞ্জে যেতো। বাপ্-মা ভাইবোনদের ক'দিন একনাগাড়ে না দেখলেই হাঁফ ধরতো। আর কেষ্টগঞ্জে আসা মানে মা ভাইবোনদের যত্ন আত্তি করা, বাবার কাজকর্মের খোঁজখবর নেওয়া। পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে গল্পে দিনগুলো স্বপ্নের মতো কেটে যেতো।

কিন্তু ইদানীং আর যাওয়া হয়ে ওঠে না। বড়জোর কালেভদ্রে এক আধদিন। তা'ও সকালে গিয়ে সন্ধ্যার মুখে ফিরে চলে আসে আসাননগরে। নিজের সংসার। আর একটা সংসারের ঝামেলা কি কম! খুঁটিনাটি কাজ তো লেগেই আছে। সর্বোপরি ও চলে গেলে মেঘাইকে কে দেখে।

মেঘাই যখন কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে এগ্রামে বা পাশের গাঁয়ে যাত্রা করতে যায়, পাড়ার বৌ-ঝিদের সঙ্গে কুসুমও যায় সেই যাত্রা দেখতে। ছোটোবলায় অনেক যাত্রা দেখছে। কিন্তু শাড়ী ধরার পর

থেকে মা যেতে দিতো না।

যাত্রার আসরে মেয়েদের ভীড়ের মধ্যে বসে দেখেছে মেঘাইয়ের পালা। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকেছে। বুকটা স্বামীগর্বে ভরে উঠেছে। এতো মেয়ের মধ্যে ওর মতো স্বামীভাগ্য আর কার! কৃষ্ণের সাজে মেঘাইয়ের হাতের বাঁশি যখন ব্যাকুল সুরে আকুল হ'তো—কুসুমের মনে হ'তো এ আহ্বান যে ওরই প্রতি। আর সঙ্গে সঙ্গে মনটা কেঁদে উঠতো। যে পুরুষটা ওকে এতো ভালোবাসে, তাকে ও কি দিতে পেরেছে! ভবিষ্যতেই বা কি ও দিতে পারবে? কি আছে ওর দেবার মতো। হ্যাঁ, হৃদয়। আর সেই হৃদয়-সায়রে ফোটা পদ্মটাই ও তাকে দেবে।

মাঝে মাঝে গণপতি, নটবরদের সঙ্গে দলবেঁধে মেঘাই যশোরের ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙা বা দূরের কোন গ্রামে যাত্রা করতে যায়। তখন যেন নিজেকে অত্যন্ত একলা বলে মনে হয়। সারাটা দিন কোন কাজে মন বসে না। দৈনন্দিন কাজগুলোতে এমন এক একটা ভুল করে বসে যে নিজেরই লজ্জা করে। রান্নাঘরে অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই মন বসাতে পারে না। উন্মনা মনটাকে প্রতীক্ষার প্রহরে বেঁধে রাখতে পারে না। সারারাত একলা বিছানায় এপাশ ওপাশ করে। ঘুমোতে পারে না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, না এবার ফিরে এলে আর যেতে দেবে না।

কিন্তু পারে না। দশটা গাঁয়ের লোক স্বামীকে চিনবে, সুখ্যাতি করবে—এই লোভেই মেঘাইকে ধরে রাখতে পারে না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে। লোক উপচে-পড়া আসর আর তার মধ্যে কালীয় দমনের অভিনয় করে চলেছে কালো মদন। হাততালি আর আনন্দে আসর ফেটে পড়ার জোগাড়।

কথাগুলো ভাবতেও রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে কুসুম। পরের দিন সূর্য ওঠার আগেই গ্রামের পথে ঘাটে মেঘাইয়ের প্রশংসা সুরু হয়ে যাবে।

এক একবার নিজেকে অত্যন্ত স্বার্থপর মনে হয় ওর। মা মারা

গেছে বেশ কিছুদিন। খবর পেয়ে কুসুম গিয়েছিলো। কিন্তু কয়েক দিনের বেশী থাকে নি। থাকতে পারে নি। এদিকের সংসার ফেলে বেশীদিন কোথাও থাকতে যেন ইচ্ছা করে না। মানুষটা সারাদিন কী করলো, কী খেলো কে জানে। জমি থেকে ফিরে এসে সময় মতো হাত-পা ধোবার জল পেলো কিনা, ও না দেখলে এসব কে দেখবে! যা মানুষ; কুসুম হাতের কাছে এগিয়ে না দিলে হয়তো বা না খেয়েই থাকবে। তবু মুখ ফুটে কিছু চাইবে না। এক এক সময় রাগ হয় কুসুমের। কেন, নিজের প্রয়োজনটা নিজে একটু বুঝেসুঝে নিলেই তো পারে। আবার মনে হয়, পুরুষ মানুষ বাইরের কাজে যতোই শক্ত হোক্, ঘরের কাজে নেহাৎ-ই অসহায়। প্রথমে ভেবেছিলো, ছোট ছোট ভাইবোনগুলোর একটা ব্যবস্থা করে, বাবার সংসারটাকে একটু দাঁড় করিয়ে তবে আসবে। কিন্তু অতোদিন থাকতে পারে নি। চলে এসেছে। নিজের সংসার ছেড়ে কোথাও গিয়ে দু'টো দিন মন টেকাতে পারে না কুসুম। ইন্দুমতীর ছেলে হবার সংবাদ পেয়ে যাই-যাই করেও শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া আর হয়ে ওঠে নি। হয়তো বা ইন্দুমতী কিছু মনে করে বসে থাকবে। ওর বিয়ের সময় তো কম করে নি। তবু কুসুম কি করবে! ওর নিজেরও তো যাওয়ার ইচ্ছে কম নয়। কিন্তু ও গেলে ঘরের মানুষটা যে অচল। বাবাও সংবাদ দিয়ে পাঠিয়েছে কয়েক দিনের জন্য বাড়ীতে যেতে। কুসুম মনে মনে ভেবে রেখেছে, মেঘাই দূরে কোথাও যাত্রা করতে গেলে আগে থেকে জিজ্ঞাসা করে রাখবে। ক'টা টাকাও রেখে দিতে হবে। এতো বড়ো বাড়ীর বৌ হয়ে শুধুহাতে তো যাওয়া যায় না। লোকে কী বলবে! মেঘাই সম্পর্কেই হয়তো বা অন্য রকম ধারণা করে বসে থাকবে।

বিশ্বম্ভরেরও বয়েস হয়েছে। সুতরাং যত্ন আত্তিরও প্রয়োজন। আর তার ওপর কুসুম একমাত্র পুত্রবধূ। আরেকটা জা থাকলে না হয় তবু হ'তো। কাজেই প্রয়োজনের তুলনায় ওকে একটু বেশীই এদিক-টাতে নজর দিতে হয়। আর শাশুড়ি তো পুরো সংসারের ভার ওরই ওপর ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। সুতরাং শ্বশুরকেও ওকেই দেখতে হয়! সময় মতো জল-খাবার দেওয়া, স্নানের জল পুকুর থেকে তুলে আনা,

সন্ধ্যেবেলা চণ্ডীমণ্ডপে তাস-পাশা খেলতে যাবার আগে কৌটোয় তামাক গুছিয়ে দেওয়া, এসব কুসুমকেই করতে হয়।

এতো কাজ ওকে কুমারী জীবনে করতে হয়নি। অভাবের সংসার, রোজ উনোনে আগুন জ্বললেই যথেষ্ট। হোক কাজ করতে, তবু কুসুমের এতোটুকু ক্লান্তি লাগে না। বিরক্তি আসে না। বরং সংসারের কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে যেন ও আনন্দ পায়। সুখী মনে হয়।

দুপুরবেলা ঘরের কাজ সেরে মেঘাই যখন মাঠে, বিশ্বম্ভর ঘরের ভেতরে দিবানিদ্রার তোড়জোড় করছে, কুসুম এসে বসে দাওয়ার পাশে বাঁধানো গাছটার নীচে। হাতে কোন সেলাই-ফোঁড়াই নিয়ে। ইতি-মধ্যে ছোট ছোট কয়েকটা বেনিয়ান সেলাই করেছে। মেঘাইকে দেখলেই লুকিয়ে ফেলে। ঘরছুট্ সামনে থেকে পালায়।

গাঁয়ের একটা বৌ প্রায়ই ওর কাছে আসে। বৌটার জন্য কুসুমের কষ্ট হয়। ঘর করতে গিয়েও ঘর করতে পারে নি। কোলে একটা ছেলে নিয়ে বাপের সংসারে ফিরে এসেছে। কি আর করবে! এই অসহায় অবস্থায় যাবেই বা কোথায়? ভরা যৌবনে নিজের সংসারে যার কাটানোর কথা, বাপের হেঁসেলেই তার দিন কাটে। তবু শান্তি নেই।

উঠতে বসতে কথা কম শুনতে হয় না। দুপুরবেলা কাজের ফাঁকে তাই ছেলেটাকে নিয়ে এসে বসে কুসুমের কাছে। বাইরের মেয়েদের সঙ্গে বেশী মিশতে পারে না। বিবাহিতরা ওকে অন্য চোখে দেখে। ওর চরিত্রের দোষ দেয়। আর কুমারীদের বাড়ী থেকে তাদের চোখে চোখে রাখে। ওর সঙ্গে মিশলে দশটা কথা উঠলে তখন যে বিয়ে দেওয়াই দায় হয়ে উঠবে।

কিন্তু কুসুম দূরে সরিয়ে রাখতে পারে নি। দুপুরবেলা বৌ-টা এলেই বাচ্চাটাকে কোল থেকে টেনে নেয়। আদর করে। চুমু খায় প্রাণভরে।

সংসারকে কিছু না দিলে সংসারও কিছু দেয় না। আর কুমারী জীবনে মেয়েরা সংসারকে যে চোখে দেখে বধূ হয়ে সে দৃষ্টি থাকে না।

বরং কুমারী জীবনের কামনা-বাসনাগুলো তখন পূর্ণতা পায়। আর সব ছেড়ে দিয়ে মেয়েরা তখন স্বামী সংসারকেই আঁকড়ে ধরে।

কুসুমও প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে নতুন সংসারকে। তবু মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা কাঁটা বেঁধে। বিয়ের পর তিনটে বছর গড়িয়ে গেল, তবু এখন পর্যন্ত কোল ফাঁকা। এক একসময় বড়ো শূন্য লাগে। ইচ্ছে যায়, ছোট ছোট কচি দু'টো হাত এসে ওকে জড়িয়ে ধরুক। অস্পষ্ট কথার কাকলিতে ঘর ভরে দিক। লুকিয়ে লুকিয়ে পাড়ার মেয়েদের দিয়ে অনেক থানে পূজো দিয়েছে। অনেক ফকিরের কাছে দোয়া মেগেছে। রাতে মেঘাইয়ের বুকের ওপর মাথা রেখে সব খুলে বলেছে। মেঘাই কোন প্রত্যুত্তর করে নি। শুধু উষ্ণ আলিঙ্গনে ওকে জড়িয়ে ধরেছে।

সত্যি কি তা'হলে কুসুমের কোলে কেউ আসবে না? ভরা সংসারে এই শূন্যতা কুসুম তাহ'লে কি করে সহ্য করবে?

॥ ছয় ॥

সংসারী হবার পর মেঘাইকে অনেক কিছুই ছাড়তে হয়েছে। অবশ্য সবাইকেই হয়। বিয়ের আগে তো দায়িত্ব বলতে কিছু থাকে না। কিন্তু এখন আরেকটা জীবনের পরিপূর্ণ দায়িত্ব, সুখ-দুঃখ নির্ভর করছে ওর ওপর। যার চোখের জল আর মুখের হাসি শুধু ওকেই ঘিরে।

ইদানীং যাত্রা-টাত্রাও ছেড়ে দিয়েছে মেঘাই। সন্ধ্যের পর ও আর নটবর, গণপতিদের সঙ্গে যায় না। বাবা বিশ্বম্ভরের বয়েস হয়ে গেছে। সুতরাং সংসারের সবটাই এসে পড়েছে ওর ঘাড়ে। মেঘাইও আপত্তি করে নি। স্বীকার করে নিয়েছে।

সারাটা দিন জমিতে মুনীষদের পেছনে খেটে সন্ধেবেলাটা আর চণ্ডীমণ্ডপে কাটাতে ইচ্ছে যায় না। বিয়ের আগে না হয় একা ঘরে

বসতে মন চাইতো না ; কিন্তু এখন তো আর একা নয়। গণপতি আর নটবরের মতো করে স্ত্রী'কে নিজের জীবনে নিতে পারে নি মেঘাই। তাকে যখন বরণ করে ঘরে তুলেছে, তখন ভালোবাসার দায়িত্বও তো ওর। ওর ঘরে ফেরার প্রতীক্ষায় যে গভীর তিতিক্ষা নিয়ে কুসুম অপেক্ষা করে, তারই জন্য মেঘাইয়েরও বাইরে মন টেঁকে না। আর টিকবেই বা কি করে ?

একটু শ্যামলা হলেও কুসুম সুন্দরী। ওর শান্ত ডাগর চোখ দু'টো আকর্ষণে ভরা। জমি থেকে ও বাড়ী ফেরার আগেই কুসুম গা ধোয়। ক্ষারে কাচা রঙীন শাড়ী পরে। প্রায়ই হাটের থেকে তাঁতের শাড়ী কিনে এনে দেয় মেঘাই। আর এই বয়সে না পরলে কবে পরবে ? কোলে দু'একটা এলে তো আর পরতে পারবে না। তাই রঙীন শাড়ী না পরলে মেঘাই কথা বলে না। মুখ ভার করে থাকে। তাই কুসুমও রঙীন শাড়ী ছাড়া পরে না।

সেই শাড়ী পরে চোখের কোণে কাজল এঁকে কপালে সিঁদুর টিপ দিয়ে ও যখন মেঘাই বাড়ী ফিরলে হাত-পা ধোয়ার জল এগিয়ে দেয়, তখন ওকে কি সুন্দরী-ই না দেখায়। মেঘাইকে ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে বাঁ হাতে ঘোমটাটা আরো নীচে নামিয়ে দিয়ে বলে,—কী অমন হাঁ করে দেখছো বলোত ? ওর কথায় মেঘাই লজ্জা পায়। তাড়াতাড়ি হাত-পা ধুয়ে ঘরে ঢোকে। কুসুম দিনের আলোতে আর মেঘাইয়ের মুখোমুখি হয় না। রান্নাঘরের সব কাজ সেরে ধোয়া মোছার পাট চুকিয়ে তবে আসবে। ততোক্ষণ অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

নিজের বিবাহিত জীবনের দিকে তাকিয়ে ওর রাগ হয় গণপতি আর নটবরের ওপর। ছোটবেলাকার বন্ধু। পাঠশালায় যাবার পথে অনেকদিন ওরা পাঠশালায় না গিয়ে মাঠে প্রজাপতির পেছনে ছুটে বেড়িয়েছে, ঝোপঝাড়ে বৈঁচী খুঁজেছে। কিন্তু আজ সে দিনগুলো কোথায় ?

একটু বয়েস হ'তেই ওরা অন্য পথ ধরেছে। সুস্থ সুন্দর দিকটাতে আনন্দ খুঁজে না পেয়ে সমাজের নোংরা দিকটাতে গেছে। উঠ্‌তি

বয়েসেই বাবা বিয়ে দিয়েছে। তবু ওদের মতিগতি বদলায় নি। মেঘাই ওদের বুঝিয়েছে, কী এমন দেহের দাবী যা ঘরের বৌ মেটাতে পারে না? তারপরে অবশ্য বুঝেছে, এটা একটা নেশার মতো। পেটে তরল আগুন পড়লেই ঘরের বৌ আর নজরে ধরে না। ছোটে কালনা অথবা কদমতলী। ওদের বৌ-রাও বা কেমন? মনটা বিষিয়ে ওঠে। ঘরের পুরুষকে কেন ওরা ঘরের মধ্যে ধরে রাখতে পারে না? ভাঙা নৌকো চালাতেই তো ভালো মাঝির দরকার। পাগলটার গানের সেই জায়গাটা মনে পড়ে:

ওরে ডুবিছে নাও ডুবাইয়া বাও
ওরে বণিক নাইয়া।
ওরে ভাঙ্গা নাও যে বাইতে পারে
তারে বলি নাইয়া॥

০ ০ ০

ওরে পথের মাঝে ফাঁদ পেতেছে
বাজীকরের মাইয়া।

বিয়ের আগেই ভেবেছিলো, যেমন করেই হোক্ এদিক থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখবে। ছাঁদনাতলায় পবিত্র মন্ত্রের মাধ্যমে যাকে গ্রহণ করবে, নিজেকে পবিত্র না রাখতে পারলে তার মুল্য আর কতোটুকু! সে মন্ত্র, সে মিলন তো নিষ্প্রাণ। কিন্তু আজ?

আজও তো কুসুমকে ফেলে মন-ঘোড়াটা লাগাম ছাড়ে না। নটবর, গণপতিদের মতো ওর রক্তেও তো রয়েছে পুরুষের কামনা, বাসনা। তবু কুসুম ছাড়া অন্য মেয়ের মুখ তো মনে আসে না। আবার পর মুহূর্তেই মনে হয়, কুসুমের সঙ্গে ওদের তুলনা করা বোকামী। ওর মতো স্ত্রীভাগ্য হলে হয়তো বা গণপতিরাও এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতো না।

গণশার ডাকে ভাবনায় ছেদ পড়ে। ছেলেটাকে বেশ ভালো লাগে। সহজ সরল। বয়েসে ওদের থেকে কিছুটা ছোট। গ্রামের সব ব্যাপারেই আগে না হলেও পেছনে থাকে ছেলেটা।

ক'দিন ধরেই অঞ্চলের আবহাওয়াটা উত্তপ্ত। থমথমে। আগে

হলে অবশ্য মেঘাই এসব নিয়ে মাথা ঘামাতো না। কিন্তু এখন পুরো সংসার কাঁধের ওপরে। সুতরাং গ্রামের ভাগ্যের সঙ্গে ওর ভাগ্যও জড়িত। তবু এসব ঝঞ্ঝাট চিরদিনই ও এড়িয়ে যেতে চায়। পৃথিবীটা যে ভাবে ইচ্ছে তার পরিক্রমা করুক, তা'তে মেঘাইয়ের কিছু যায়-আসে না। কিন্তু এবার আর সে চিন্তায় ডুবে থাকা সম্ভব হয় নি। কারণ জমিতে শুধু ওর সুখ স্বাচ্ছল্যই বাধা নয়, ভাগ্যও বন্ধক দেওয়া। তাই ইচ্ছে থাক'লও গণশাকে হটিয়ে দিতে পারে নি।

আজ গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপে সবাই জড়ো হবে। এদিক ওদিক থেকে উড়ো খবর যা আসছে, বিশ্বাস না হলেও বুকের ভেতরটা কাঁপন ধরিয়ে দেয়। এতোদিন মেঘাই এসব কথা কানে তোলে নি। নিজের ঘর-সংসার, বৃদ্ধ বাপ-মা আর কুসুম—এদের স্বপ্নেই বিভোর ছিল। দিন-ভর জমিতে প্রাণ দিয়ে খেটেছে আর কুসুমকে জড়িয়ে ধরে রাতভর স্বপ্ন দেখেছে, দিনে দিনে একটু একটু করে সামর্থ্য অনুযায়ী জমি বাড়াবে। কারণ সংসার তো আর এ ক'টা মুখ নিয়েই স্থির থাকবে না। কিন্তু আজ, এই মুহূর্তে সেই সুখের চিন্তাতে সংঘাত এসে দেখা দিয়েছে। শুধু একার ওর নয়, সমস্ত আসান নগর জুড়েই এই ভয়ের আর অস্বস্তির কালো ছায়া। এক একবার কথাটাকে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে যায়। অবিশ্বাস করে মনে সুখও পায়। কুসুমের ডাগর চাউনি, লজ্জা-রাঙা মুখ—সেখানে অন্য কিছু কল্পনাতে আনাও কষ্টকর।

গণশাকে যেতে বলে দিয়ে মেঘাই ঘরে ঢোকে কামিজ পরতে। আরো দশটা গাঁয়ের লোক জড়ো হবে চণ্ডীমণ্ডপে। সুতরাং কাপড়ের খুঁট গায়ে দিয়ে যাওয়া যাবে না।

পাশের ঘরের থেকে বিশ্বম্ভরের জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেওয়ার শব্দ আসছে। বাবার কথা ভেবে কষ্ট হয়। সারাটা জীবন অমানুষিক পরিশ্রম করে এখন একেবারে শয্যাগত। কারোর সাহায্য ছাড়া উঠে বসতেও পারে না।

কামিজটা গায়ে দিতে গিয়ে দেখে কুসুম এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েছে। ওকে কামিজ পরতে দেখে জিজ্ঞাসা করে,– এই ভর

সন্ধ্যেবেলায় আবার কোথায় বেরোচ্ছো? সারাটা দিন তো রোদে পুড়ে এলে।

ওর দিকে তাকায় মেঘাই। অন্য দিনের চেয়ে আজ একটু বেশী সেজেছে। আকাশ-রঙা শাড়ীতে অপূর্ব দেখাচ্ছে কুসুমকে। ইচ্ছে হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ওকে দেখতে। কিন্তু পারে না। গণশা তাড়া দিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে না গেলে হয়তো বা আবার আসবে।

কুসুমের কাছে এগিয়ে এসে ওর চিবুকটা নেড়ে দিয়ে মেঘাই বলে, —চণ্ডীমণ্ডপে যাচ্ছি। আজ একটা জমায়েত আছে। ভীমপুর, দুধ-গোলা, খাল-বোয়ালিয়া থেকেও লোক আসবে। সুতরাং না গেলেই নয়। ফিরতে রাত হ'তে পারে। ভেবো না, কেমন?

মেঘাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

চণ্ডীমণ্ডপে এসে দেখে নটবর, গণপতি, পাশের গাঁয়ের আলি শেখ, শরিফুদ্দিন, ছিদাম প্রভৃতি সবাই এসেছে। এমন কি কেষ্টনগর বড়ো গীর্জে থেকে জার্মান পাদ্রী ফাদার বমভাইটিস্ পর্যন্ত হাজির। বিদেশী হলেও লোকটাকে মেঘাইয়ের ভালো লাগে।

সাদা লোকগুলো সম্পর্কে ওর ধারণা ভালো নয়। কাজের জন্য মাঝে মাঝে কেষ্টনগরে গিয়ে দেখেছে, সাদা মানুষগুলো সেই সাত সাগর আর তের নদী উজান বয়ে এসে এদেশের কালো লোকগুলোর ওপর কি অত্যাচারটাই না করে। এদেশের লোকগুলো যেন মানুষ নয়; ওদের গাড়ীর ঘোড়া-গাধা। এই তো সেদিনের কথা। নিষিদ্ধ জন্তুর চর্বি দেওয়া বন্দুকের টোটা ব্যবহার করবে না বলে ব্যারাকপুরের কতগুলো সিপাই হঠাৎ ক্ষেপে উঠলো। মিলিটারী ব্যারাকে ব্যারাকে আগুন ছড়িয়ে পড়লো। সেই আগুনের হল্কা হাওয়ার আগেই ছড়িয়ে পড়লো বহরমপুর মিলিটারী ব্যারাকে, মীরাট ক্যান্টনমেন্টে, ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি শহরে, গঞ্জে ও গ্রামে। তখন ওদের এই আসাননগরের পাশের রাস্তা দিয়ে গেছে বিরাট বিরাট মিলিটারী কনভয়। কেষ্টনগর হয়ে বহরমপুরে।

মেঘাইরা সারাটা রাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারে নি। দিনের বেলা ভয়ে কেঁপেছে। সৈনিকগুলো সেই বিদ্রোহী সিপাই

খোঁজার নামে নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর অত্যাচার কম করে নি। কয়েকটা বছর কেটে গেলেও মেঘাই সে স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি। হাটে মাঠে গোরা সৈন্য দেখলেই প্রাণভয়ে ছুটে পালিয়েছে। তবু অনেকে ওদের হাত থেকে রেহাই পায় নি।

কিন্তু সাদা হলেও ফাদারকে এই অঞ্চলের সবাই ভালোবাসে। আর বাসবেই বা-না কেন? মুখে হাসি ছাড়া একটা কথার টুকরোও বলে না। সাদা হলেও তো ইংরেজ নয়। ইংরেজদের সঙ্গে নাকি ওদেরও বনিবনা নেই।

ছোটবেলায় পৌষের সারাটা রাত শীতে কেঁপে যখন প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়তো আসান নগরের আকাশের বুকে, মেঘাইরা দল বেঁধে রাস্তার ধারে যেতো রোদ পোয়াতে। তখন দেখতো অতো ভোর সকালে উপাসনা সেরে ফাদার কেষ্টনগর থেকে বেড়াতে বেড়াতে এদিকে আসছেন। মুখভর্তি দাড়ি, পরনে কালো আজানুলম্বিত সিল্কের গাউন, বুকের ওপর ঝোলানো সোনার ক্রশ, হাতে বাইবেল। সকালের রোদ্দুর এসে পড়তো ওঁর ক্রশের ওপর। দূর থেকে চিক্ চিক্ করতো। সেই সকালে ফাদারকে মনে হ'তো ঠিক যেন যীশুর প্রতিমূর্তি। ওদের দেখতে পেলেই হাতছানি দিয়ে ডাকতো। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতো। পকেট থেকে নানারকম খাবার জিনিষ বার করে দিতো। তারপর আবার হাতে ধরা বাইবেলটা পড়তে পড়তে কেষ্টগঞ্জের দিকে চলে যেতো।

গাঁয়ের যারা খৃষ্টান হয়ে নিয়মিত কেষ্টনগরের বড়ো গীর্জেয় যেতো, তাদের মুখে ওর অদ্ভুত জীবনের কাহিনী শুনেছিলো মেঘাই। অবাক হয়েছিলো সব শুনে।

ওরই মতো সাধারণ চাষীর ঘরের ছেলে নাকি এই ফাদার বম-ভাইটিস্। অনেক কষ্ট করে পড়েছিলেন ডাক্তারী। কিন্তু মানুষের দেহের রোগ সারাতে গিয়ে দেখলেন, দেহের চেয়ে মনের রোগ অনেক বেশী গভীরে। দেহের রোগ ওষুধ বিসুধে সারলেও মনের রোগ এতো সহজে যাওয়ার নয়। তাই দক্ষিণ জার্মানীর সেই গণ্ডগ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন এই পৃথিবীর পথে। ডাক্তার বমভাইটিস্ রূপান্তরিত

হয়েছেন ফাদার বমভাইটিসে। এদেশ সেদেশ ঘুরতে ঘুরতে কেষ্টগঞ্জের বন্দরে এসে ভিড়েছেন।

ইউরোপের একটা দেশ যখন ভারতবর্ষকে শোষণ আর অত্যাচারের নাগপাশে বেঁধে ফেলেছে, ঠিক সেই সময় ইউরোপেরই আরেকটা মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে সেই বঞ্চিত হতভাগ্যদের পাশে। ভাবতেও মেঘাইয়ের আশ্চর্য লাগে

সেই জমায়েতে ফাদার বমভাইটিস্, ঝিনাইদহের মহেশ চাটুয্যে, চৌগাছার বিষ্ণুচরণ, দিগম্বর প্রভৃতি সবাইকে দেখতে পায় মেঘাই। বুঝতে পারে ব্যাপারটাকে যতোটা হাল্কা ভাবে নিয়েছিল, ঠিক ততোটা সহজ নয়। বরং রীতিমতো জোরদার। ভেতরে ভেতরে কিসের যেন একটা প্রস্তুতি চলছে। এক একবার মনে হয়, ও কেন এর ভেতরে যেতে যাবে! গ্রীষ্মের শান্ত মাথাভাঙায় আজ বর্ষার ঢল নামার তোড়জোড় চলেছে। ভাসিয়ে নেবে সবকিছু। ওর শান্ত সংসারেও সেই ঢেউ এসে আছড়ে পড়বে।

তবু নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারে না মেঘাই। সবার সঙ্গে ওর ভাগ্যও যে জড়ানো।

নীলকরের দল ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। এক একটা গ্রামে নীলকুঠি গড়ছে। দাদন দিয়ে ভালো ভালো জমিতে জোর করে নীলের চাষ করাচ্ছে। একদিন ওদের গ্রামেও আসবে। সেদিন?

কোন কোন জমিদার টাকার লোভে রায়তদের স্বার্থ না দেখে নীল সাহেবদের ডেকে আনছে। আর কেউ চেষ্টা করেও নীলকুঠির লাঠিয়ালদের হাত থেকে জমি বাঁচাতে পারছে না। ফাদার বমভাইটিস্ যদিও সবাইকে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করতে বলেছে, তবু বোধহয় সেটা সম্ভব নয়।

জামায়েত শেষ হয়ে গেলেও মেঘাই মনে মনে একটা উত্তেজনা অনুভব করে। যৌবনের রক্তে আজ যেন ঝড়ের ডাক এসে পৌঁছেছে। নতুন এক নেশা লেগেছে। পরের দিন এ অঞ্চলের সবাই যাবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হার্সেলের কাছে। ওকে থাকতে হবে পুরোভাগে। নেতা নির্বাচনের ব্যাপারে সবাই একবাক্যে ওর নাম জানিয়েছে।

মেঘাই ভেবেছিল কুসুমকে একবার জিজ্ঞাসা করে নেবে। কিন্তু এতোগুলো মানুষের কথার ওপরে আর কথা বলতে পারে নি। স্বীকার করে নিতেই হয়েছে।

বাড়ীতে ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে যায়। কুসুম তখনো খায়নি। ও বাড়ী ফিরে না খাওয়া পর্যন্ত কুসুম খাবেনা। মাঠটা ঘুরে আসবার সময় দেখে এতো রাতে পাগলাটা মাঠের একধারে বসে গান গেয়ে চলেছে :

আমায় ভাসাইলে কোন্ ঘাটে ?
আগে আন্ধার, পাছে আন্ধার
আন্ধার নিশুইত ঢালা—
আন্ধার মাঝে কেবল বাজে
সহরেরি মালা !
তারার তলে কেবল চলে
নিশুইত রাতের ধারা।

গানটা মেঘাইয়ের মনের মধ্যে প্রচণ্ড ভাবে নাড়া দেয়। যে পথে ও আজ এগিয়ে চলেছে, সে পথ আঁধারের। তার কিছুই ওর জানা নেই। তবু এতোগুলো মানুষের মুখ চেয়ে এগিয়ে ওকে যেতে হবেই। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢাকা আকাশেও তো একসময় গ্রহ-নক্ষত্র ওঠে।

স্থানীয় জমিদার বিজয় মুখুয্যে স্পষ্টই বলে দিয়েছে, নীলকরদের বাঁধা দেওয়া সম্ভব নয়। খাজনা দিয়েই তো তারা জমি নিতে চাইছে।

মেঘাইয়ের চোখের ওপর ভেসে ওঠে জমায়েতের মধ্যে এসে দাঁড়ানো জমিদার বাড়ীর ছোট বৌঠানের চেহারাটা। এর আগে ছোট বৌঠানের কথা শুনলেও চোখে দেখে নি। টকটকে গায়ের রঙ; নীলকুঠির মেমদের মতো। যদিও মুখ ওড়নায় ঢাকা, তবু কথাবার্তায় তেজের ছাপ স্পষ্ট।

পথে আসতে আসতে মনে পড়ে ছোট বৌঠানের কথাগুলো। মেয়েমানুষের ভেতরে যে এতো আগুন লুকিয়ে থাকতে পারে মেঘাই কি তা' কোনদিন ভেবেছিলো ? ঝিনাইদহের মহেশ চাটুয্যে অথবা

চৌগাছার বিষ্ণুচরণ আর দিগম্বর বিশ্বাসের কথাও যেন অতোটা মেঘাইয়ের অন্তর নাড়া দেয় নি।

বাড়ী ফিরে দেখে কুসুম দরজায় দাঁড়িয়ে। মেঘাই ঘরে ঢোকে। বুঝতে পারে রাত করে বাড়ী ফেরায় কুসুমের অভিমান হয়েছে। অন্য-দিন হলে মেঘাই আগে ওর মান ভাঙাতে বসতো। ওকে কাছে ডাকতো। আদর করতো। তারপর বুকের মাঝে টেনে নিতো। কুসুমও আর নিজেকে ধরে রাখতে পারতো না। মেঘাইয়ের বুকে মুখ লুকিয়ে দাবী জানাতো পরের হাটে নতুন কোন উপহারের। কিন্তু আজ যেন অন্য কোনদিকে মনটা যেতে চায় না।

জমায়েতে সবাই আসান নগরের ভার মেঘাইয়ের ওপর তুলে দিয়েছে। আশেপাশের আরো কয়েকজন অবশ্য যাবে। ওখানে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হার্সেলের সঙ্গে দেখা করে আবার যেতে হবে দামুর হুদায়। মহেশবাবুর সঙ্গে দেখা করে বলতে হবে সব। সবাই একজোট না হলে ম্যাজিষ্ট্রেটকে দাবী জানানো হয়তো বা সম্ভব হবে না।

ঝিনাইদহের মহেশ চাটুয্যে দামুর হুদার কৃষকদের মধ্যে আগুন জ্বালিয়েছে। চব্বিশ পরগণার জমিদার তিতু মীর কিছুতেই নীল বুনবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে মেঘাইয়ের। কই এতোদিন তো প্রাণের ভেতরে এ উত্তেজনা অনুভব করে নি? এ যেন এক নতুন নেশা। আফিমের চেয়েও তীব্র।

মেঘাই কামিজ ছাড়তে গেলে কুসুম বলে,—কি ব্যাপার? এতো রাত হলো যে? অভিমানে কুসুমের চোখ দু'টো টলটল করছে। এক্ষুণি হয়তো বা উপচে পড়ে গালের উপত্যকা ভাসাবে।

কাছে এগিয়ে এসে বুকে টানতে গেলে কুসুম একটু সরে দাঁড়িয়ে বলে,—বাবার সন্ধ্যে থেকেই শরীরটা আবার খারাপ করছে। হরি-বিলাসীকে দিয়ে কবরেজমশায়কে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

মেঘাই জামাকাপড় না ছেড়েই বাবার ঘরে যায়। মাঠ থেকে ফিরে হাত-পা ধোয়ার সময় কুসুম বলেছিলো, বাবার শরীর খারাপ। কিন্তু মেঘাই কথাটায় অতো গুরুত্ব দেয় নি। ভেবেছিলো, সন্ধ্যের মুখে

আবার বেরোচ্ছে বলে হয়তো বা সোজাসুজি বাধা না দিয়ে এইভাবে দিচ্ছে। আর গণশার তাড়ায় ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বাবাকে দেখে যেতে পারে নি। অতোগুলো লোকের মাঝ থেকে তাড়াতাড়ি উঠেও আসা যায় না।

বাবার ঘরে ঢুকে দেখে শরীর বেশ খারাপ। সন্ধ্যেবেলায় কবরেজের দিয়ে যাওয়া ওষুধ মা খাওাচ্ছেন। মেঘাই ঘরে ঢুকতে বিশ্বম্ভর বলে,—মেঘা এসেছিস নাকি রে ?

ধীরে ধীরে বাবার শিয়রে গিয়ে বসে মেঘাই। কপালের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বলে,—হ্যাঁ বাবা, আমি এসেছি।

—এতো দেরী হলো কেন রে ?

—চণ্ডীমণ্ডপে আজ একটা জমায়েত ছিলো তাই।

মেঘাই চুপ করে। বুঝতে পারে বিশ্বম্ভর ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিশ্বম্ভর বলে,—মেঘা, খাল-বোয়ালিয়ায় শুনেছি নীলকুঠি হয়েছে, আর তার জন্যই নাকি এই জমায়েত। সত্যি নাকি রে ?

—বাবা তুমি চুপ করে ঘুমোও। এইসব সাত-পাঁচ ভাবলে শরীর আরো বেশী খারাপ করবে।

মেঘাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। মনটা আরো বেশী বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। কাল কেষ্টনগরে না গেলেই নয়। যে দায়িত্ব ওর ওপর এসে পড়েছে, ইচ্ছে থাকলেও তা' ঝেড়ে ফেলে দেবার উপায় নেই।

খেয়েদেয়ে বিছানায় শুয়েও মেঘাইয়ের ঘুম আসে না। এপাশ ওপাশ করে। কে জানে আগামী ভবিষ্যৎ ওকে কোথায় নিয়ে যাবে।

॥ সাত ॥

আজকের সকালটা যেন মেঘাইয়ের চোখে আলাদা লাগে। সারাটা রাত কেটেছে এক অদ্ভুত উত্তেজনায়। কুসুমকে শুয়ে শুয়ে সবই বলেছে। ভেবেছিলো, কুসুম হয়তো বা ভয় পাবে, নয়তো বাঁধা দেবে। মেঘাই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলো যে ওকে যথাসাধ্য বোঝাবার চেষ্টা করবে।

কিন্তু ব্যাপারটা ততোদূর গড়ায় নি। বাবার শরীর খারাপের কথা তুলে কুসুম অবশ্য একটু আপত্তি তুলেছিলো। মেঘাই আমল দেয় নি ওর সে কথায়। বাইরের কাজকে ঘরের মেয়েরা কোনদিনই বুঝতে চায় না।

তবু মনটা কুসুমের ওপর সহানুভূতিতে ভরে ওঠে। মেয়েরা চির-দিনই ঘর বাঁধতে চায়, শত অভাব অভিযোগের মধ্যেও। নটবর, গণপতি—ওদের বৌ-রা যতো কান্নাকাটিই করুক, ঘর তো ভাঙে নি। বরং ওদেরই তো ঘরের দিকে মন নেই। জন্মের প্রথম প্রভাতেই বিধাতাপুরুষ সম্ভবত ওদের কপালে ঘর বাঁধার মন্ত্র লিখে দেন। তাই এতো ঝড় ঝঞ্ঝা, রোদ বৃষ্টিতেও ওরা বুক দিয়ে সে ঘর বাঁচাতে চায়।

রোদ-রেখাটা দাওয়ার ওপরে আড়াআড়ি ভাবে পড়েছে। কয়েকটা রোদের টুকরো গিয়ে পড়েছে দাওয়ার একপাশের সুপারী গাছগুলোর চিরোল-চিরাল পাতাগুলোর ওপরে। মেঘাই কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখে সুপারী গাছগুলোর পাতায় সেই রোদ-রশ্মির নাচন। রান্নাঘরের চালে এক যোগে ক'টা শালিকের ঝগড়া।

সেই ভোর সকালে উঠেই কুসুম ঘাট থেকে স্নান সেরে এসে রান্না-ঘরে ঢুকেছে। প্রথমদিকে মেঘাই বারণ করতো। কিন্তু কুসুম শোনে নি। মুখিয়ে উঠে বলেছে,—স্নান না করে রান্নাঘরে ঢুকব কী করে? তোমাদের না হয় এঁটোকাটার বিচার নেই। কিন্তু মেয়ে হয়ে আমরা

বাছবিচার না করলে যে লক্ষ্মীঠাকরুণ পা উঠোবেন।

এরপরে মেঘাই আর কোন কথা বলেনি।

আজ কুসুম অন্যদিনের চেয়ে সকালে উঠেছে। মানুষটা সদর শহর কেষ্টনগরে যাবে। সুতরাং ফিরতে ফিরতে কতো দেরী হবে কে জানে।

মেঘাই ঘুম থেকে উঠে বাবার ঘরে ঢুকে দেখে বাবা তখনো ঘুমোচ্ছে। মনে খটকা লাগে। অবশ্য সারাটারাত ঘুম হয় নি ভালো। তাই শেষরাতের দিকে হয়তো বা ঘুমিয়ে পড়েছে।

মুনিষরা ইতিমধ্যে দাওয়ায় ভীড় করেছে। মেঘাই একে একে ওদের কে কোন্ জমিতে খাটবে, কি কাজ করবে বুঝিয়ে দেয়। ভাগ-চাষীরা ফসল নিয়ে এসেছে। সেগুলো গোলায় তোলার ব্যবস্থা করে। তারপর কুসুম জলখাবার দিয়ে গেলে তা' খেয়ে জামাকাপড় পরে প্রস্তুত হয়ে নেয়। চৌ-গাছা থেকে বিষ্ণুচরণ আসবে, তাকে সঙ্গে নিয়ে খাল-বোয়ালিয়ার হলধরের কাছে যাবে।

খাল-বোয়ালিয়ার গাছতলায় জমা হয়ে সবাই একসঙ্গে যাবে কেষ্ট-নগরে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিসে। একে ম্যাজিষ্ট্রেট, তায় আবার ইংরেজ। বুকটা কেঁপে ওঠে। তবু জোর করে মনের ভেতরে সাহস আনে। আর তা' আনতে হয় হলধরের কথা ভেবে।

প্রথমে নাকি গ্রামের কেউ নীলকরদের ধারে কাছে ঘেঁষে নি। জোর করে এঁটে ওঠা যাবে না দেখে নীলকর সাহেবরা স্থানীয় লোকেদের নানা উপায়ে দলে টানে। অবস্থাও খুব ভালো ছিলো না হলধরের। সুতরাং নীলকুঠির চাকরীতে সবার আগে ও-ই এগিয়ে এসেছিলো। বাঁধা মাইনে মানেই নিশ্চিত ভবিষ্যত।

প্রথম থেকেই সাহেবগুলোর হাবভাব ভালো ঠেকে নি হলধরের। কিন্তু করারই বা কি আছে? রোজ রোজ ভাগের জমির জন্য তো আর নায়েবের কাছে গিয়ে ধর্ণা দিতে হবে না। নায়েবের মর্জি হলো তো জমি পাবে। তাও নিজের ভাগের ফসলের অনেকটাই আবার চুপচাপ নায়েবের ঘরে তুলে দিতে হয়। নইলে জমি আবার বে-হাত। তার-চেয়ে নীলসাহেবদের একটু মর্জিমাফিক চললেই মাসের শেষে বাঁধা মাইনে। সুখের সংসার।

হ্যাঁ, সুখ-স্বাচ্ছল্য সবই এসেছিলো হলধরের সংসারে। ছ'টো তো মুখ। হলধর নিজে আর আদরের বোন গোলাপী। শুধু খাল-বোয়ালিয়া কেন, আশে পাশের সাতটা গাঁ খুঁজলেও গোলাপীর মতো সুন্দরী মেয়ে ছ'টো পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। বাপ্ মা মরা মেয়ে। হলধর নিজে কষ্ট করেও বোনকে যতোটা পেরেছে সুখে রাখতে চেষ্টা করেছে। গোলাপ ফুলের মতো রঙ, টানা টানা আয়ত চোখ।

ভাইবোনের সংসার। সারাটা দিন বাইরে কাটিয়ে ফিরে এসে হলধর আঙিনা থেকেই হাঁক দিতো,—গোলাপী! আর গোলাপীও যেন ওই ডাকটার জন্যই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতো। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতো। হাত-পা ধোওয়ার জল এগিয়ে দিতো। আর হলধর তাকিয়ে দেখতো বোনের দিকে। দিনে দিনে শশীকলার মতোই বেড়ে উঠছে মেয়েটা। রূপ যেন ফেটে পড়ছে জমিদার বাড়ীর মেয়েদের মতো। এক একসময় মনে হ'তো গরীবের ঘরে এতো রূপ কেন? পরক্ষণেই মনে হ'তো, গরীবের ঘরে রূপ না থাকলে পরের ঘরে বোনকে পাঠাবে কি করে? রূপো তো নেই।

বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেলেও হলধর বিয়ে করেনি। বৌ ঘরে এলে বোনের অযত্ন হবে। তার চেয়েও বড়ো কথা, সামান্য এই উপার্জনে আরেকজনে ভাগ বসাবে, যাক্ না ক'টা দিন। এতো সুন্দরী বোনকে তো যার-তার হাতে তুলে দেওয়া যায় না। ভালো ঘরে-বরেই বোনকে দেবে হলধর। তারপর নিজের বিয়ের কথা চিন্তা করবে। পুরুষের আবার বিয়ের বয়েস!

হাতে যা জমিয়েছে তার সঙ্গে আর কিছু যোগ করতে পারলেই বোনকে পলদা বিলের ওপারের চড়ুইটিপির সাহা বাড়ীতে তুলে দিতে পারবে। গোলাপীও সুখে থাকবে আর হলধরও নিশ্চিন্ত। ওর খাওয়া-পরার তো আর কষ্ট কোনদিন হবে না। কারণ সাহাদের ভাগের চাষের ফসল খেয়েই শেষ করা যায় না। সাহা বাড়ীর থেকে গোলাপীকেও দেখে গেছে। মুখে কিছু না বললেও হলধর বুঝেছে, গোলাপীর রূপের রঙ ওদের চোখে লেগেছে। এবার কিছু রূপোর যোগাড় করতে পারলেই হলো, গোলাপী আর সাহাবাড়ীর ছোট

ছেলেটার হাত দু'টো এক জায়গায় করে দিতে পারে। তারপর কুঠির চাকরী ছেড়ে দেবে।

এই আশাতেই অনেক স্বপ্ন নিয়ে গ্রামের সবার নিষেধ সত্বেও হলধর নীলকুঠির চাকরী নিয়েছিলো। পয়সা আসছিলো প্রচুর। মনে মনে ভেবে রেখেছিলো, শীতটা কেটে গেলেই তো আসবে ফাল্গুন। গাছে গাছে নতুন পাতা গজাবে। খাল-বোয়ালিয়ার খালের শুকিযে যাওয়া জলে ছোট ছোট ঢেউ উঠবে। আর হলধর সাহা বাড়ীতে গোলাপীর বিয়ের জন্য খবর পাঠাবে।

দিন-দুই পরেই নীলকর সাহেবদের বছরের সবচেয়ে বড়ো উৎসব। হলধরও বেশ খোশ মেজাজেই ছিল। সাহেবদের উৎসব মানেই হাতে অতিরিক্ত দু'টো পয়সা আসা। পবিত্র যীশুখৃষ্টের জন্মদিন। আগের রাতে মদের জোগাড় করতে হলধর গিয়েছিলো সদর শহর কেষ্টনগরে। এতো বড়ো উৎসবে মদের অঢেল ব্যবস্থা না থাকলে যে উৎসবটাই মাটি।

সারাটা রাত কেষ্টনগরে মদের জোগাড় করে, সেগুলোকে কুঠিতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে হলধর বাড়ী ফিরে আসে। রোজকার মতো আঙিনা থেকেই হাঁক দেয়,—গোলাপী।

কিন্তু ওর সেই ডাকে ঘর থেকে অন্যদিনের মতো গোলাপীকে ছুটে বেরিয়ে আসতে না দেখে অবাক হয়। আশ্চর্যও লাগে। কয়েকটা মুহূর্ত অপেক্ষা করে দেখে ঘরে কেউ নেই।

প্রথমে ভেবেছিলো হয়তো বা গোলাপী ঘাটে জল আনতে গেছে। নয়তো বা পাড়া পড়শী কারোর বাড়ীতে গেছে গল্প করতে। কিন্তু হলধরের হাতেও যে আর বেশী সময় নেই। সন্ধ্যার পরই কুঠিতে উৎসব সুরু হবে। সুতরাং হলধরকে যে এক্ষুণি যেতে হবে।

ভারাক্রান্ত মন আর মাথায় একরাশ চিন্তা নিয়েই হলধর কুঠির দিকে যায়।

কুঠিতে ঢুকে একটা ঘরের থেকে ছেঁড়া ছেঁড়া জড়ানো কথা ভেসে আসায় হলধর দাঁড়িয়ে পড়ে। মনে মনে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সাহেব-গুলোর ওপর। পেটে একটু তরল আগুন পড়লেই ওরা আর নিজেকে

ধরে রাখতে পারে না। জন্তু জানোয়ারের মতো বে-পরোয়া হয়ে ওঠে।

দরজাটা পেরিয়ে যেতে গিয়েও পারে না। ভেতর থেকে দমকে দমকে হাসিটা ভেসে আসছে। এগিয়ে গিয়ে দরজার ফাঁকে চোখ রাখতেই সমস্ত শরীরটা থর থর করে কেঁপে ওঠে। দৃষ্টির সামনে সমস্ত পৃথিবীটা দুলে ওঠে। কতোগুলো মাতাল জানোয়ার সম্পূর্ণ উলঙ্গ গোলাপীকে উপভোগ করছে।

এক লহমার বেশী দাঁড়াতে পারে নি হলধর। ছুটে বেরিয়ে এসে-ছিল কুঠি থেকে।

আর কোনদিন ওমুখো হয় নি। কি করে হবে? ওখান থেকে বোনকে ফিরিয়ে আনলেও সমাজ তো আর নেবে না। তার চেয়ে হারিয়ে যাওয়া বোন হারিয়েই যাক।

তবু মাঝে মাঝে বোনের জন্য মনটা যখন ভীষণ ভাবে কেঁদে ওঠে, তখন হলধর কেষ্টনগরের কদমতলীতে অথবা বধমানের মহাজন টুলিতে খুঁজে বেড়ায় গোলাপীকে। কে জানে? কোথায় গোলাপীকে শান্তি খুঁজে নিতে হয়েছে। হয়তো বা মহাজন টুলিতে, নয়তো বা মাথা-ভাঙা অথবা পলদা বিলের জলে।

একাজ সেকাজে অনেকবারই মেঘাই সদর শহর কেষ্টনগরে এসেছে। কিন্তু আজকের সঙ্গে সে আসার পার্থক্য অনেক।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিসটা একেবারে শহরের শেষপ্রান্তে। খড়ে নদীটার গা ঘেঁষে। অনেকখানি হাতা নিয়ে লালরঙের বাড়ীটা।

ঢুকতে গিয়ে মেঘাইয়ের বুকটা দুরু দুরু করে ওঠে। এর আগে কোনদিন কোন ইংরেজের মুখোমুখি হয় নি। আর এ তো একেবারে খোদ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। তবু লোকটা সম্পর্কে ওরা যতোদূর শুনেছে তা'তে মনে হয় মানুষটা নেহাৎ খারাপ নয়। এই যা বাঁচোয়া। যশোর, চব্বিশ পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ওভেন সাহেব তো, শুনেছে একটার বেশী দু'টো কথা বললেই ফাটকেই পুরে দেয়। দিনের পর দিন দানাপানি কিছু না দিয়ে আটকে রাখে।

মেঘাই ইতিউতি তাকাতে দেখে ফাদার বমভাইটিস্ সাইকেলে চড়ে এদিকেই আসছে। ফাদারকে দেখে বুকে অনেক বেশী সাহস পায়। এতোক্ষণের কাঁপুনিটা কমে আসে। লোকটার প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরে ওঠে।

ফাদার ওদের সঙ্গে নিয়ে হার্সেলের দপ্তরে আসে। মেঘাই, বিষ্ণুচরণ, হলধর একে একে নমস্কার জানিয়ে ঘরের কোণে গিয়ে দাঁড়ায়।

ও আশা করেছিলো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়তো বা ওদের বক্তব্য বুঝবেন। জমিদার বোঝে নি কারণ প্রজাদের থেকে যে টাকা পাওয়া যাবে, তারচেয়ে বেশী দেবে নীলকরেরা।

হার্সেল সোজাসুজি ফাদারকে বলে দিয়েছে যে এ ব্যাপারে তার করার কিছু নেই। জমি তো তার নয়, জমি হলো জমিদারের। আর সে যদি টাকার লোভে জমিদারীর ভেতরে নীলকুঠি বসায় তবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে তার তো কিছু করার নেই।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস থেকে বেরিয়ে ফাদার বমভাইটিস্ গীর্জায় চলে যায়। হলধর আর বিষ্ণুচরণকে খবর দেবার জন্য আগেই গ্রামের দিকে রওনা করিয়ে দেয়। মেঘাই পরে যাবে। কেষ্টনগরে যখন এসেছে তখন সংসারের জন্য টুকিটাকি কিছু না নিয়ে গেলে তো আবার কুসুমের মুখ গোমড়া।

কেষ্টনগরের বাজারে আসে মেঘাই। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে হবে। বিশ্বম্ভরের শরীরটা ক'দিন ধরেই খারাপ যাচ্ছে।

বাজার থেকে সওদা সেরে বাড়ীর দিকে হাঁটে মেঘাই। রাস্তাটা নিরালা, নির্জন। আজকাল সমস্ত অঞ্চলটাতে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। সদর কেষ্টনগরের অবস্থাও খুব একটা ভালো লাগে নি। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস থেকেই শুনেছে, চব্বিশ পরগণার তিতু মীর প্রচুর লাঠিয়াল আর সড়কিওয়ালা জড়ো করেছে। যেমন করেই হোক, নীল কুঠি নিজের অঞ্চলে গড়তে দেবে না। লোকটা সম্পর্কে অনেক শুনেছে মেঘাই। একগুঁয়ে এবং ধর্মের দিক থেকে নাকি ভীষণ গোঁড়া। ইসলামের ভেতরেও আবার নিজের সম্প্রদায় ছাড়া অন্য সম্প্রদায়কে

সহ্য করে না। ওর সঙ্গে বাকি যোগ দিয়েছে ভূষণার জমিদার মনোহর রায়।

সকাল থেকে যে ভয়টা মেঘাইয়ের বুকের ভেতরে কাঁপন ধরিয়েছিলো, সেটা অনেকটা কমে এসেছে। মনটা তাই ফাদারের ওপর শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে। হোক না বিদেশী, বিধর্মী—তবু কথাবার্তায় কী প্রচণ্ড সহানুভূতি আর সহমর্মিতার সুর ছড়ানো। হার্সেলের অফিসের অন্যান্য ইংরেজ কর্মচারী অথবা খাল-বোয়ালিয়ার নীল সাহেবদের মতো রুক্ষ নয়। ফাদারকে বিদেশী বলে ভাবতে মন চায় না। মনে হয় নিজেদেরই একজন। দেশ নয়, জাত নয়, মানুষের উদারতাই মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। নইলে ভিনদেশী এই মানুষটাই বা কেন মেঘাইদের জন্য, এদেশের মানুষগুলোর জন্য এতো ভাবতে যাবে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস থেকে বেরিয়ে ফাদার ওকে বড়ো গীর্জায় যেতে বলেছিলো। কিন্তু বাবার শরীর খারাপের কথা ভেবে ইচ্ছে থাকা সত্বেও অন্যদিন আসবে বলে আর যায় নি।

একমনে মেঘাই পথ চলে। হার্সেল সোজাসুজি জবাব দিয়ে দিয়েছে। এবার ওরা কি করবে? কোন্ পথ ধরে এগোবে? কেষ্টনগর থেকে ফিরে এসে ছোট বৌঠান ওদের দেখা করতে বলেছেন। আজকে রাতে আর সময় হয়ে উঠবে না। কাল বৌঠানের সঙ্গে দেখা করবে। ঝিনাইদহের মহেশ চাটুয্যের কাছেও খবর পাঠাতে হবে। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে মেঘাই বাড়ীর সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। বাড়ীটা কেমন যেন নীরব। নিস্তব্ধ। অন্ধকার। পাড়ার কয়েকটা লোক উঠনের একধারে জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ওর বুকটা কেঁপে ওঠে। তবে বাবার কি কিছু হয়েছে? মেঘাইকে দেখে আঙিনার লোকগুলো সরে দাঁড়ায়। গণপতি, নটবর, ছিদাম সবাই রয়েছে। ঘরে ঢুকে দেখে কুসুম একটা খুঁটি ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে। এলোমেলো বেশবাস। অজানা একটা আশংকা ভেতর থেকে পাক খেয়ে ওপরে উঠে আসে। এগিয়ে গিয়ে কুসুমের সামনে দাঁড়ায়। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মেঘাই ডাকে,— কুসুম!

কুসুম কোন উত্তর দেয় না।

ওকে নিরুত্তর দেখে মেঘাই বলে,—কি হয়েছে কুসুম? কথা বলছো না কেন?

এতোক্ষণের স্তব্ধ শিলায় যেন কাঁপন লাগে। কুসুমের সংবিত ফেরে। ওর দিকে তাকিয়ে বলে, বাবা নেই।

ছোট্ট দু'টো শব্দ। কিন্তু শব্দ দু'টোই যেন মেঘাইয়ের কানে বিরাট সমুদ্রের গর্জন হয়ে সামনের পৃথিবীটাকে মুছে দেয়। ক্ষণিকের জন্য দেহের সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলে। এতোদিন নিজে পরিশ্রম করলেও মাথার ওপরে সব সময় একজনের ছায়া অনুভব করেছে। বাবা মাথার ওপরে থাকাতে সংসারের সব ব্যাপারে মন দিতে হয় নি। কিন্তু আজ থেকে সব ভার ওর ওপর। ঘরে বাইরে নিঃস্বার্থ ভাবে উপদেশ দেবারও কেউ নেই। সন্ধ্যেবেলা জমি থেকে ফিরে এসে বাবার ঘরে বসতো। সংসার, জমি সম্পর্কে টুকিটাকি কথাবার্তা হ'তো। আজ থেকে সে সব আর হবে না।

সামনে দাঁড়িয়ে কুসুম কাঁদছে। উঠোনে গ্রামের অনেকেই অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে। এই পরিবেশে নিজেকে কেমন অসহায় মনে হয়। নটবর এগিয়ে এসে মেঘাইকে বলে, চল মেঘাই।

ওর সঙ্গে পায়ে পায়ে ঘরে ঢোকে মেঘাই। মা বাবার শিয়রের কাছে বসে অঝোরে কেঁদে চলেছে। গাঁয়ের মেয়েরা মা'কে ধরে রয়েছে। শোকাবহ এই পরিবেশে মেঘাই ঘরের একটা কোণে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর একরাশ কান্নায় ভেঙে পড়ে।

মৃতদেহের সৎকার করে মেঘাই যখন মাথাভাঙার জলে স্নান করতে নামে তখন দীর্ঘ রাতের অন্ধকার কেটে গিয়ে পূব আকাশে আলো ফুটেছে। নরম রোদে ভরে গেছে নীল আকাশটা। মাথাভাঙার জল সেই আগের মতোই ছোট ছোট ঢেউয়ে এগিয়ে চলেছে। কোথায় কে জানে? মেঘাইয়ের মনটা উদাসীন হয়ে যায়। দুঃখ বলতে জীবনে এই প্রথম।

সারাটা রাত সৎকার থেকে সব কাজ করেছে ঘোরের মতন। ভোরের ভরা আলোয় সেই ঘোর কেটে গিয়ে চেতনা ফিরে আসে।

জীবনে যে যাবার সে যাবেই। তাকে চেষ্টা করেও মেঘাই ধরে রাখতে পারবেনা। সুখ-দুঃখই জীবন। আর তার মাঝেই জীবন-নদীটা মাথাভাঙার মতোই এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলে। সেখানে নেই স্থিতু, নেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাববার মতো অবকাশ। এগিয়ে ওকেও যেতে হবে।

সংকার সেরে বাড়ীতে ফেরে মেঘাই। বাড়ীটা শোকের স্তব্ধতায় ঢাকা পড়ে আছে। কুসুম আর মা সেই একই ভাবে বসে বসে কাঁদছে।

ওকে বাড়ী ফিরতে দেখে কুসুম ওঠে। মানুষটা সেই কাল সকালে বেরিয়েছিল। হয়তো বা সারাটা দিনরাত পেটে কিছু পড়ে নি। ঘাট থেকে তাই তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এসে হবিষ্যির জোগাড় করতে বসে।

ছোট বৌঠান বলেছিলো জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে ফিরে এসে কাল সন্ধ্যেবেলাই খবর দিতে। ও যায় নি বলে আজ সকালে আবার লোক পাঠিয়েছে।

মেঘাই পরে যাবে বলে দিয়েছে। কোন কিছু ভালো লাগে না। শূন্যতায় ভরে গেছে পৃথিবীটা। এক একবার ভাবে মানুষ তো অমর নয়। যেতে তো হবে সবাইকেই একদিন। মায়ায় কে আর কতোদিন ধরে রাখতে পারে! তবু মন মানে না। মাঝে মাঝে মনটা হু হু করে কেঁদে ওঠে।

দুঃখের রাত দীর্ঘ হলেও একসময় প্রভাত হয়। দিনের আলোয় আবার সুরু হয় জীবন-পরিক্রমা। আর মানুষকেও সেই সঙ্গে সমস্ত শোক বুকে চেপে রেখে দৈনন্দিন কাজকর্ম করে যেতে হয়। প্রথম দিকে ভেঙে পড়লেও ধীরে ধীরে আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে দিনগুলো।

বাবার শ্রাদ্ধ-স্বস্ত্যয়ন সেরে মেঘাই আবার কাজে মাতে। ছোট বৌঠান খবর পাঠিয়েছিলো কয়েকবার। বাবার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় যেতে পারে নি। এবার যেতে হবে।

এর আগেও বাৎসরিক খাজনা দিতে অথবা জমিজমার ব্যাপারে

বেশ কয়েকবারই জমিদার বাড়ী গেছে। অবশ্য সেরেস্তায়। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেছে সেরেস্তার কাজকর্ম। প্রৌঢ় নায়েব করুণাবাবু। নামের সঙ্গে মানুষের এতো বড়ো অসংগতি সচরাচর চোখে পড়ে না। দৃষ্টিতে পৃথিবীটার প্রতি সব সময়ই চরম একটা অবজ্ঞা আর তীব্র বিতৃষ্ণা ছড়ানো।

জমিদারকে কখনো সামনাসামনি দেখেনি মেঘাই। আর দেখবেই বা কীকরে? জমিদার বিজয় মুখুয্যের তো দিন কাটে ঘুমে আর রাত পার হয় মদের গ্লাস সামনে রেখে, জলসাঘরে বাইজীর নূপুরের নিক্কন শুনতে শুনতে। বায়না নিয়ে কতো দূর দূর থেকে বাইজীরা আসে। তার ওপর প্রজাদের বয়স্থা সুন্দরী মেয়ে আর নতুন বিয়ে হওয়া বৌদের প্রতি লোভ তো আছেই। সুতরাং প্রজাদের দিকে নজর দেবার মতো সময় কোথায়। তাই তাদের ভাগ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা নায়েববাবু।

কুসুমের ডাকে মেঘাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। ছোট বৌঠান পরিচারিকা পাঠিয়েছে। মেঘাই বুঝতে পারে ছোট বৌঠানের উদ্বিগ্নতা।

ঘরে ঢুকে কামিজটা গায়ে দিয়ে মেঘাই জমিদার বাড়ীতে আসে। খাজাঞ্চীখানার সামনে দিয়ে ঢোকা যাবে না। নায়েববাবু বসে আছে। সন্দেহ হয় নায়েববাবুর পেছন দিকেও বোধহয় চোখ আছে। জলসাঘরের পেছন দিয়ে, রাসমঞ্চের পাশ ঘেঁষে খিড়কির দোর দিয়ে মেঘাই অন্দরমহলের ভেতরে ঢোকে। সার সার অনেকগুলো ঘর। বিরাট মহল।

একটা ঘরের সামনে এসে পরিচারিকা দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর ওর দিকে ফিরে বলে,—একটু দাঁড়াও সর্দার, ছোট বৌঠানকে খবর দি।

মেঘাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে। এর আগে জমিদার বাড়ীর অন্দরমহল আর কোনদিন দেখেনি। তবে কিছুটা লোকমুখে শুনেছে আর বাকীটা কল্পনায় গড়েছে। কিন্তু আজ বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করে যে ওর সেই কল্পনাতে অনেক খুঁত ছিল। বুকের ভেতরে একটা ভয়ও এসে জমা হয়। যদি কেউ দেখে ফেলে? ছোট বৌঠান হয়তো বা নেহাৎ-ই একটা খেয়ালবশে এ পথে নেমেছে। বড়োলোকের কতোরকম খেয়ালই তো থাকে। হয়তো দু'চার দিন পরে

বৌঠানের এ সখ মিটে যাবে, কিন্তু মেঘাইয়ের তো এর সঙ্গে সবকিছু জড়িত। ওর সংসার, ওর ভবিষ্যৎ, ভাগ্য। আর কুসুমের সুখ-দুঃখ, হাসি কান্না।

পরিচারিকার ডাকে ভাবনায় ছেদ পড়ে। ওর পেছনে মেঘাই ছোট বৌঠানের ঘরে ঢোকে। মেঘাইয়ের দিকে তাকিয়ে বৌঠান সামনের জলচৌকিটা দেখিয়ে বলে—বসো। তারপর পরিচারিকার দিকে ফিরে বলে,—লক্ষ্মী, তুই একটু বাইরে যা।

লক্ষ্মী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। মেঘাই এবার ভালো করে বৌঠানকে দেখে। এর আগে এমন সামনা-সামনি আর কোনদিন ছোট বৌঠান কেন, জমিদার বাড়ীর কোন মেয়েকেই দেখে নি।

ঘরের চার কোণে চারটে সেজ জ্বলছে। মাঝখানে অবশ্য একটা ঝাড় লণ্ঠন। তবে জ্বালা হয় নি। সম্ভবত জমিদারবাবু এঘরে পদার্পণ করলে তবেই ওটায় আলো জ্বালানো হয়। চারটে সেজের আলোয় ঘরটা সম্পূর্ণ আলোকিত হয় নি। কেমন যেন রহস্যময় ছায়া ম্লানতা সমস্ত ঘরটাতে ছড়ানো।

বৌঠান ঘরের এক কোণে বসে। কাঁচা বয়েস। জমিদার বিজয় মুখুয্যের সঙ্গে ছোট বৌঠানের বয়েসের পার্থক্য অনেক। মেঘাইদের মতো গৃহস্থ ঘর হলে জমিদারবাবুর এর চেয়ে বড়ো মেয়ে-ই থাকতো। স্থির হয়ে বৌঠান একমনে কি যেন ভাবছে। বিষণ্ণ মুখাবয়বে কাতর একটা দৃষ্টি ফুটে উঠেছে।

মেঘাই প্রথম থেকেই আশ্চর্য হয়েছিল। জমিদার বাড়ীর বৌ, অথচ জমিদারের বিরুদ্ধেই যেন সব বিষ ঢেলে দিতে উন্মুখ।

ছোট বৌঠান দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে ওর ওপর রাখে। তারপর বলে,—লক্ষ্মীর মুখে তোমার সব কথা শুনেছি। তাই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি। তুমি তো জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়েছিলে। তা' কতোদূর কি হলো?

সাহসে ভর করে মেঘাই বলে,—হার্সেল বলেছে জমিদার যদি তার রায়তদের স্বার্থ না দেখে জমি নীলকরদের দেয়, তবে তার করার কিছু নেই।

কথাটা শুনে ছোট বৌঠান কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে,—নায়েবমশাই নাকি ইতিমধ্যেই খাল-বোয়ালিয়ার নীলকুঠীতে যাতায়াত সুরু করেছে। সুতরাং হাজার ঝামেলা করে রায়তদের কাছ থেকে টাকা আদায় করার চেয়ে নীলকরদের কাছ থেকে নিশ্চিন্তে টাকা পাবার পথটাই তোমাদের জমিদার বেছে নেবে। কারণ আমি যতোদূর জানি, জমিদারের এখন টাকার প্রয়োজন খুব বেশী। অনেক-দিন জলসাঘরের ঝাড় লণ্ঠন জলে নি। আর লখনউ অথবা কোলকাতা থেকেও কোন ঢাকা ল্যাণ্ডো ফিটন বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ায় নি।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে,—ঝিনাইদহের মহেশবাবুকে কথাগুলো জানিয়েছিলে ?

মেঘাই উত্তর দেয়,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাঁর কি মত ?

মহেশবাবু তো আসান নগরের সবাইকে দলবদ্ধ হ'তে বলেছেন। উত্তরটা শুনে ছোট বৌঠানের মুখে যে পরিবর্তনের আভাস ফুটে ওঠে মেঘাইয়ের তা' নজর এড়ায় না।

জায়গা ছেড়ে উঠে বিছানার নীচে থেকে বৌঠান কতোগুলো কাগজ বার করে আনে। মেঘাইয়ের হাতে দিয়ে বলে,—কাগজগুলো হলো 'হিন্দু পেট্রিয়ট্'। কোলকাতায় গিয়ে এর সম্পাদক হরিশবাবুর সঙ্গে দেখা করো। মহেশবাবুকে আমার নাম করে সঙ্গে যেতে বলো। তারপর হরিশবাবু কি বলেন, লক্ষ্মীকে পাঠালে ওর সঙ্গে এসে আমায় জানিয়ে যেও, কেমন ?

মেঘাই উঠে দাঁড়ায়। ওকে উঠে দাঁড়াতে দেখে বৌঠান জিজ্ঞাসা করে, কোলকাতায় যাবার টাকা আছে ?

—সপ্তাহের শেষে হাটে পাট বিক্রী করবো, তার পরেই যাবো কোলকাতায়।

—একটু দাঁড়াও। ওকে দাঁড়াতে বলে বৌঠান পাশের ঘর থেকে টাকা এনে ওর হাতে দিয়ে নীচু স্বরে ডাকে,—লক্ষ্মী ? লক্ষ্মী পাশেই কোথায় অপেক্ষা করছিলো। বৌঠানের ডাকে ঘরে ঢোকে।

—ওকে সাবধানে বার করে দিয়ে আয়তো।

মেঘাই লক্ষ্মীর পেছনে পেছনে অন্দরমহল থেকে জলসাঘরের পেছন দিয়ে রাসমঞ্চের পাশ ঘেঁষা রাস্তা ধরে বাইরে বেরিয়ে আসে।

॥ আট ॥

মেঘাইকে পৌঁছে দিয়ে লক্ষ্মী ফিরে এসে দেখে ছোট বৌঠান ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। আজ প্রায় সাত আট বছর আগে ছোট বৌঠান এ বাড়ীতে বধূ হয়ে আসার সময় লক্ষ্মীকেও বাপের বাড়ী থেকে সঙ্গে করে এনেছিলো। ব্যক্তিগত পরিচারিকা বা বন্ধু বলতে ছোট বৌঠানের কাছে লক্ষ্মীই সব। তাই মনের সুখদুঃখের সব কথাই ওকে খুলে বলে বৌঠান। আর না বলে করবেই বা কী? মনের কথা খুলে বলার মতো কেউ তো আর নেই। এতো বড়ো বাড়ী, মানুষ-জনে সারাটা দিন গমগম করছে। কিন্তু এই জনারণ্যের ভীড়ে দাঁড়িয়েও ছোট বৌঠান কতো একলা। মাঝে মাঝে লক্ষ্মীর কষ্ট হয়। নিজের মনে রাগও করে। বড় বৌঠান, মেজ বৌঠান সবাই তো এ বাড়ীর মর্জির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে। তবে ছোট বৌঠানই বা কেন নিজের অতীত ভুলে গিয়ে এ বাড়ীর স্রোতের মাঝে নিজেকে মিলিয়ে মিশিয়ে দিতে পারছে না?

অবশ্য সংসারের সবাই সব পারে না। তা' হলে তো অনেক সমস্যার সমাধান নিজে থেকেই হয়ে যেতো। ছোট বৌঠানকেও জ্বলে পুড়ে মরতে হ'তো না এই আগুনে।

একটু এগিয়ে এসে লক্ষ্মী ডাকে,—ছোট বৌঠান!

প্রথম ডাকে ছোট বৌঠান সাড়া দেয় না। পর পর ক'বারের ডাকে সংবিত ফেরে। জানলার বাইরেই দৃষ্টিটাকে নিবদ্ধ রেখে জিজ্ঞাসা করে,—কিরে লক্ষ্মী, আমায় কিছু বলছিস?

বৌঠান শুতে গেলে হাত-পা টিপে গল্প করে ঘুম পাড়িয়ে তবে লক্ষ্মীর ছুটি। কোন কোনদিন লক্ষ্মী আর নিজের ঘরে শুতে যায় না।

গল্প করতে করতে বৌঠান ঘুমিয়ে পড়লে তার পাশে লক্ষ্মীও শুয়ে পড়ে।

—রাত হয়ে গেছে, শুতে যাবে না বৌঠান ?

—তুই শুতে যা লক্ষ্মী, আমার ঘুম আসছে না।

লক্ষ্মী জানে জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আজ ছোট বৌঠান ভাববে। এমনি হয় মাঝে মাঝে। সারাটা রাত ঠায় জানলার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকদিন মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে লক্ষ্মী দেখেছে, ছোট বৌঠান পাশে নেই। অন্ধকার ঘরে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে। নির্বাক, নিস্পন্দ। যেন কৃষ্ণনগরের ঘূর্নির তৈরী মাটির পুতুল।

লক্ষ্মী নিজের ঘরে যাবার জন্য বাইরে পা বাড়াতে ছোট বৌঠান ডাকে,—লক্ষ্মী।

ঘুরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মী বলে,—আমায় কিছু বলবে বৌঠান ?

—বাবু কোথায় রে ?

—বাবু কোলকাতায় গেছে। লখনউ থেকে আখতার বাঈ এসেছে। সেই বাইজী নাকি আবার এই গণ্ডগ্রামে আসবে না। তাই বাবু জানবাজারে বাড়ী কিনেছে।

—তুই আলমারীর চাবিটা রেখে যা।

—আবার সেই ছাইভস্মগুলো খাবে বৌঠান !

ওর কথায় ছোট বৌঠান হঠাৎ রাগে ফেটে পড়ে,—তোর অতো খোঁজখবরে কি প্রয়োজন রে ? যা বলছি শোন।

লক্ষ্মী ধীরে ধীরে আঁচলের থেকে চাবিটা খুলে ফরাসের ওপর রেখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

জমিদারবাবু হয়তো কাল সকালে রোদ উঠে গেলে ফিরবে। চার ঘোড়ায় টানা ঢাকা ফিটন অর্ধচেতন দেহটাকে বয়ে নিয়ে আসবে এ বাড়ীর সামনে। তারপর চাকর দাসীরা ধরাধরি করে তুলবে দোতলায়। সারাটা দিন শুয়ে থাকবে। সন্ধ্যার পর খোয়াড়ি কাটলে ডাক পড়বে বাড়ীর বৌয়ের।

প্রথম দিকে কান্না পেতো। বুক ফেটে জল বেরিয়ে আসতে

চাইতো। কেঁদে কেটে লক্ষ্মীকে বিপর্য্যস্ত করে তুলতো। দু'টো চোখের পাতা এক করতে পারতো না।

কিন্তু আজ আর আসে না। চোখের জলেরও বোধ হয় একটা সীমা আছে। একসময় সেই নোনা সাগরও বুঝি নিঃশেষ হয়ে যায়। অন্ততঃ ছোট বৌঠানের তাই মনে হয়। কই, আজ তো আর চোখ দিয়ে জল বেরোয় না। পরিবর্তে নিষ্ঠুর একটা প্রতিহিংসা রক্তে রক্তে জ্বালা ধরায় সবকিছু পুড়িয়ে ছাই করে দিতে ইচ্ছে হয়। এ বাড়ী কি ওর যে এর প্রতি ওর মায়া থাকবে! এ বাড়ীর অনেক কিছুর মতোই তো ওকেও ধরে এনে জোর করে চারটে দেওয়ালের ভেতরে বন্দী করে রেখেছে।

নীলকর সাহেবদের কাছে জমি বিক্রী করে নিশ্চয়ই কিছু কাঁচা পয়সা হাতে এসেছে। সেটা না উড়িয়ে দিয়ে বিজয় মুখুয্যে কোলকাতা থেকে ফিরবে না। মদ আর মেয়ে, মেয়ে আর মদ—এই দু'টোতেই যেন এ তল্লাটের সমস্ত প্রজাদের ভাগ্য বাঁধা। নীল সাহেবদের দেওয়া পয়সা শেষ হলে আবার নতুন করে প্রজাদের ওপর অত্যাচার সুরু হবে। চোরকুঠীতে জোর করে ধরে এনে পয়সা আদায় করবে। মনটা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। একটা মানুষের আদিম লালসার কাছে এতো-গুলো মানুষের সুখ বন্ধক দেওয়া। কিন্তু কেন?

একটু দূরেই পলদার বিল। নিকষ কালো জল। বর্ষায় জলঙ্গী যতো ফেঁপে ওঠে, পলদার বিলেও যেন ততো ঢল নামে। কানায় কানায় ভরে ওঠে বিলটা।

রাতের আকাশে সপ্তর্ষি জ্বলছে। নক্ষত্রের ঝাঁক দল বেঁধে মুখ বার করেছে। যেন পলদার বিলের জলের আয়নায় নিজেদের মুখ দেখছে।

মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় এই বিলের জলেই শান্তি খুঁজে নিতে। এমনি নিস্তব্ধ রাতে একলা জানলায় দাঁড়িয়ে থাকলেই যেন বিলটা হাতছানি দিয়ে ডাকে। কিন্তু ছোট বৌঠানের অন্তর সাড়া দেয় নি। যে ওর জীবনের সমস্ত ঘুম কেড়ে নিয়েছে, যার লালসা আজকে ওকে এখানে টেনে এনেছে, তার শেষ না দেখে এ জীবন থেকে সরে দাঁড়াতে ইচ্ছে যায় না।

লক্ষ্মী নিশ্চয়ই এতোক্ষণে গভীর ঘুমে অচেতন। কিন্তু বৌঠানের চোখে ঘুম নামে না। এক একদিন এমনিই হয়। পুরোন দিনের স্মৃতিগুলো হঠাৎ বুকের মাঝে জেগে উঠে ওর দিনের স্বস্তি আর রাতের ঘুম কেড়ে নেয়। চেষ্টা করেও মনটাকে বোঝাতে পারে না। পারে না এ বাড়ীর অবিরাম বয়ে চলা সংসারের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে। পলদার বিলের নিকষ কালো জল, মাথার ওপরের সীমাহীন আকাশ আর ফেলে আসা অতীত দিনগুলো—ওকে কিছুতেই স্থির থাকতে দেয় না।

নক্ষত্রের অস্পষ্ট আলো ঝরে পড়ছে পলদার বিলের জলের ওপর। রাত আরো গভীর হয়েছে।

প্রথম দিকে এ জীবনটাকে কিছুতেই সহ্য করে নিতে পারতো না ছোট বৌঠান। অসহ্য লাগতো। প্রতি মুহূর্তে নিজেকে শেষ করে দিতে ইচ্ছে যেতো। কিন্তু আজ অনেকটা সয়ে এসেছে। পরিবর্তে প্রতিহিংসার একটা আগুন সব সময় বুকের ভেতর দাউ দাউ করে জ্বলছে।

এ বাড়ীতে নতুন এসে প্রায় রাতেই ডাক পড়তো জমিদারের ঘরে। ঘুমের মধ্যে জমিদারের খাস দাসী রোহিণী এসে ডাকতো লক্ষ্মীকে। লক্ষ্মী ওর ঘুম ভাঙিয়ে নিয়ে যেতো বিজয় মুখুয্যের ঘরে। উদ্দাম সন্ধ্যা কাটিয়ে ছোটবাবু তখন বেহুঁস। তরল আগুনের নেশায় ভরপুর। তবু সেই অবস্থাতেই লক্ষ্মী ওকে ঘরের ভেতর পাঠিয়ে দিয়ে বাইরে অপেক্ষা করতো।

ভয়ে দুরু দুরু কালবৈশাখী-কাঁপানো বুক নিয়ে ঘরে ঢুকে এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকতো ছোট বৌঠান। সেই মাতাল অবস্থাতেই ছোটবাবু ওকে বিছানাতে টেনে নিতো। মদের গন্ধে আর ঘৃণায় সারা শরীরটা রি রি করে উঠতো। তবু উপায় তো নেই। সেই নেশার ঘোরেই ওর শরীর থেকে খুলে নিতো বেশবাস। তারপর ওকে মাতালের তীব্র নেশা নিয়েই উপভোগ করতো। বাধা দিতে চেয়েও পরতো না বৌঠান। মাতাল একটা পুরুষের সঙ্গে পারবে কি করে?

এক সময় উপভোগ শেষ হ'তো। ক্লান্ত বৌঠান শ্রান্তিতে এলিয়ে

পড়তো। লক্ষ্মী ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতো ঘরে। সেইরাতেই ছোট বৌঠান স্নান করতো। ঘষে ঘষে তুলে ফেলতে চাইতো ছোটবাবুর প্রতিটি স্পর্শ। তবু পারে নি মনের গহিন থেকে সেই সব দাগগুলো মুছে ফেলতে। সেগুলো জ্বলেছে, আর অসহায় এক রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসেছে।

আজ আর অবশ্য এতো ঘন ঘন ডাক পড়ে না। বছরে একবারও ছোটবাবুর ঘরে যেতে হয় কিনা সন্দেহ। আর হবেই বা কেন? ওর শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তো চেনা হয়ে গেছে। নিত্য নতুন যৌবন না হলে কি আর নেশার মেজাজ আসে? মুখুজ্যে পরিবারে ও একাই বধূ নয়। আরো দু'জন আছে। তবু তাদের মতো সবকিছু মেনে নিতে পারেনা ছোট বৌঠান। বুকের কোথায় যেন বেদনার একটা কাঁটা খচ্ খচ্ করে বেঁধে।

বড়ো বৌঠান, মেজ বৌঠান এসব কথা একবারও ভাবে না। সারাদিনই সেজেগুজে দাসীদের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড করে কাটায়। সন্ধ্যের পর বাবুরা জলসাঘরে গিয়ে মদের গ্লাস নিয়ে বসলে, এরাও আলমারী খুলে বোতল বার করে। রঙীন মদ ঢালে গ্লাসে। তারপর আপন মনেই কখনো হাসে, কখনো কাঁদে।

প্রথম যেদিন সরমা এ বাড়ীতে ছোট বৌ হয়ে এসেছিলো, সেদিন বড়ো, মেজ বৌঠানদের দেখে অবাক লাগতো। পুরুষদের মদ খাওয়া তবু সহ্য করে নেওয়া যায়, কিন্তু তাই বলে বাড়ীর মেয়েরা!

ও যখন খুব কান্নাকাটি করতো তখন মেজ বৌঠান, বড়ো বৌঠান অনেকদিন বলেছে,—আমাদের মতো তুইও এগুলো ধর ছোট। অনেক দুঃখ ভুলে থাকতে পারবি।

সরমা মুখের ওপর বলেছে,—তা' বলে মদ খাবো?

সঙ্গে সঙ্গে ওরা মুখিয়ে উঠেছে,—কেন খাবি না শুনি?

—পুরুষেরা ওগুলো গিললে তবু সহ্য হয়, কিন্তু আমি মেয়ে হয়ে—। ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়েই মেজ, বড় বৌঠানের গায়ে আল্তো ধাক্কা দিয়ে মুখ বেঁকিয়ে বলেছে,—আহা রে, মেয়ে হয়েও মেয়েদের কি আমরা পেয়েছি? না পেয়েছি স্বামী, না সংসার, না

সন্তান। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছে,—বুঝলি ছোট, কোথাও যদি বুকের দুঃখ লুকানো যায়, তা' হলো এই গ্লাসে।

এরপরে আর ওদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে যায় নি। নিজের ঘরে এসে আরো বেশী কান্নায় ভেঙে পড়েছে। ওর ভাগ্য এ কোথায় ওকে নিয়ে এলো ? ও তো রাজরাণী হ'তে কোনদিন চান নি।

পলদার বিলে রাত নেমেছে। ধীরে ধীরে সেই রাত এগোচ্ছে প্রভাতের দিকে। কিন্তু ওর জীবনের পদক্ষেপ তো প্রভাতের নতুন সূর্যকে লক্ষ্য রেখে নয়। পৃথিবীর বুকে রাতের আয়ু একদিন শেষ হবে। কিন্তু ওর জীবনের আঁধার রাতের মৃত্যু ছাড়া তো শেষ নেই।

জানলার পাশ থেকে সরে এসে ফরাসের ওপর থেকে লক্ষ্মীর রেখে যাওয়া চাবিটা তুলে নেয়। যেদিন ঘুম আসে না, সেদিন আলমারীর ভেতরের সাজানো বোতলগুলো কী এক আকর্ষণে যেন ওকে টানতে থাকে। অনেক চেষ্টা করেও সরমা পারে না সেই আকর্ষণের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে।

সত্যি বলতে কি, প্রথমদিকে মেজ আর বড়ো বৌঠানকে ঘৃণা করতো এই মদ খাওয়ার জন্য। কিন্তু এখন বুঝেছে এই পরিবেশে বাঁচতে হলে আর কোন পথ নেই। কারণ এই চারপাশের মোটা দেওয়াল ভেদ করে নিজেদের দুঃখ কারোর কাছে পৌঁছে দেওয়ার পথ বন্ধ। তাই বাধ্য হয়ে সরমাকেও একদিন দুঃখ ভোলবার জন্য মেজ, বড়ো বৌঠানের পথ ধরতে হয়েছে।

লক্ষ্মীকে টাকা দিলে ও-ই লোক দিয়ে কেষ্টনগর থেকে আনিয়ে দেয়। আজকাল ও নিজে থেকেই খায়। কিন্তু প্রথমদিন ওকে এই মদ খাওয়াতে ছোটবাবু কতো চেষ্টাই না করেছিলো। অনুরোধ, সাধাসাধি ; তারপরে রাগ। তবু সরমাকে টলাতে পারে নি। জোর করে দেহটাকে পেয়েছে, কিন্তু ইচ্ছেটাকে তো আর শক্তি দিয়ে বাঁধা যায় না। শেষ পর্যন্ত মদভর্তি গ্লাসটাই ওর দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলো।

আজকের দিনটাতে সরমার কোনদিনই ঘুম হয় না। কেন জানি মনে পড়ে যায় অনেগুলো বছর আগের ফেলে আসা সন্ধ্যাটাকে। কিছুতেই ভুলতে পারে না স্মৃতিটা।

আদাপোঁতার শিবদাস চক্রবর্তীর ছেলে কানাই আর সরমা বড়ো হয়েছে চড়ুইটিপির মাটিতে। সরমার বাবার বন্ধু চক্রবর্তী মশাই ছোট বেলার থেকেই সরমাকে ঘরের বৌ করে নিয়ে আসার ইচ্ছে ওর বাবাকে জানিয়ে রেখেছিলো। বাবাও হেসেই মত দিয়েছিল। অমত করার মতো কিছু নেই। পাল্টা অবস্থাপন্ন ঘর, ছেলেটাও দেখতে শুনতে মন্দ নয়। আর ওদের মতো সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়ের জন্যে কি আর রাজা মহারাজা বর হিসেবে আসবে !

সরমার খুব ভালো লাগতো কানাইকে। শান্ত, নিরীহ ছেলেটা কোন পাল-পার্বণে ওদের বাড়ীতে এলে মা সরমাকেই পাঠাতো কানাইকে হাত-পা ধোওয়ার জল আ'র জলখাবার দিতে। সরমা লজ্জায় কিছুতেই ওর ধারেকাছে যেতে চাইতো না। ওর চোখে চোখ পড়লে সেই বয়েসেই বুকের ভেতর যে লজ্জার শিহরণ দোলা দিতো, সেটাই যেন ওকে ভুলতে দিতো না কানাইকে। ছোট্ট হাতে বিরাট বড়ো তাঁতের শাড়ীটাকে কোনরকমে শরীরে জড়িয়ে নিয়ে, চুলগুলোকে পেছনে টেনে বেঁধে, কপালের ঠিক মাঝখানে জ্বলজ্বলে কাঁচপোকা টিপ এঁকে তারপর কানাইয়ের সামনে যেতো।

যার সামনে ম'র ধমক খেয়েও যেতে চাইতো না, সেই কানাই চলে গেলেই নিজেকে যেন ফাঁকা মনে হ'তো সরমার। কারণে অকারণে মনটা ছুটে যেতো আদাপোঁতায়। মনে মনে হিসেব করতো, সামনের পার্বণের আর কতোদিন বাকী। মা বাবা ওর মনের কথা বুঝতে পারতো। মুখ ফুটে কিছু না বললেও কানাই এ বাড়ীতে এলে মেয়ের চঞ্চলতা আর আর লজ্জার আভাসই যেন তা' বুঝিয়ে দিতো।

বাবা মা'কে ডেকে বলতেন,—শিবুর বাড়ীতে মা আমার যত্নেই থাকবে।

আড়াল থেকে সেকথা শুনে মনটা আনন্দে ভরে উঠতো সরমার। ভাবতো, সত্যি এতো ভাগ্যও কি একটা মেয়ের হয় ! সব সময়ই ইচ্ছে হ'তো কানাইয়ের মুখটা মনের ওপর ভাসিয়ে রাখতে।

বাবা একদিন বলেছিল, কানাই নাকি কেষ্টনগরে পড়তে যাবে। কথাটা শুনে মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিলো সরমার। কেষ্টনগর কতোদূর !

কী বিরাট শহর। আদাপোঁতা থেকে পাল-পার্বণে কানাই যে রকম চড়ুইটিপিতে আসতো, সে রকম কি আর আসতে পারবে। তবু মনকে বুঝিয়েছিলো, কেষ্টনগরে গিয়ে লেখাপড়া শিখে বড়ো হবে কানাই। জমিদারী সেরেস্তায় চাকরী করবে। আর তারপর? হোক্ না সরমাকে চড়ুইটিপি ছেড়ে যেতে।

কৃষ্ণনগরে যাবার ক'দিন আগে কানাই এসেছিলো চড়ুইটিপিতে। তখন সরমাও বড়ো হয়েছে। শরীরে প্রথম যৌবনের ঢল নামতে সুরু করেছে। বুকটাকে আর কিছুতেই শুধু শাড়ীর বাঁধনে বেঁধে রাখা যায় না। চোখের কেণে এসে ঠাঁই নিয়েছে লাজুক হাসির ঝিলিক্।

ওর সমবয়েসী মেয়েরা কেউ ওর রূপকে ঈর্ষা করতো আর কেউ বা প্রশংসা। নিজেকে সুন্দরী বলে ভাবতে সেদিন ভালই লাগতো। বিধাতার অযাচিত দানকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাতো। কিন্তু আজ মনে হয় ওর জীবনে রূপই হলো সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ।

শিবদাস ছেলেকে কেষ্টনগরে পড়তে পাঠিয়েই অস্থির হয়ে পড়ে। একমাত্র ছেলে। কেষ্টনগর যাতায়াতে ঘর ফাঁকা। তাই পুত্রবধূই সংসারের সেই শূন্যতা পূরণ করতে পারবে ভেবে সরমার বাবাকে ডেকে পাঁজি দেখে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব দিন স্থির করতে বলে।

এরপরের দিনগুলো সরমার কাটে যেন স্বপ্নের মধ্যে। এতোদিনের বাঞ্ছিত পুরুষ; সময় পেলেই যাকে সরমা রঙে রঙে সাজিয়েছে। স্বপ্ন দেখেছে সুন্দর শান্ত একটা সংসারের।

রাতের তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে বেছে বেছে উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলোকে নিয়ে যে আলোর মালা ও এতোদিন ধরে গেঁথেছে, যার জন্য অন্তরের সমস্ত নিভৃত কামনা বাসনা সঞ্চয় করে রেখেছে,সেই মনের মানুষ ওর জীবনে আসছে। সরমা তার এতোদিন ধরে লুকিয়ে রাখা মালা পরিয়ে দেবে তার গলায়। বরণ করে নেবে তাকে বুকের অন্তরতম গহিনে—এ আনন্দে দিনগুলো কেটেছিলো স্বপ্ন-মেঘের ভেলায় ভেসে।

স্বপ্ন দেখতো ছাঁদনাতলায় আত্মীয়-স্বজন, গ্রামের সমবয়েসী মেয়েরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে. তারই মাঝে সালংকারা লালচেলী চন্দনে

বিনম্রা লজ্জামুখী সরমা—মুখোমুখী বরবেশে কুশণ্ডিকা হাতে কানাই। ওর অনেক আশার পুরুষ, তারার আলোর মালা গেঁথে সরমা যাকে নিজের জীবনে আহ্বান জানিয়েছে। শঙ্খ আর উলুধ্বনিতে মুখরিত, ব্যস্ত লোকজন, সজ্জিত বাড়ীঘর আর সর্বোপরি বাবা মা'র তৃপ্তিভরা হাসিমুখ—সরমাকে কোথায় কোন এক জগতে নিয়ে যেতো। ভাবতো, পৃথিবীটা কতো সুন্দর। কী মধুময়।

কিন্তু ঘটনাটা হঠাৎ ঘটে গেল। সরমা এতটুকুও বুঝতে পারে নি। এমন কি কল্পনাতেও আনে নি কোনদিন। স্বপ্নের রঙে আঁকা এতোদিনের ছবিটার ওপর এই কালি কেউ যে অলক্ষ্যে ছিটোবে, তা' কি কখনো ভাবতে পেরেছিলো? নাকি কেউ পারে?

গায়ে-হলুদ হয়ে গেছে। দূরের আত্মীয়-স্বজনও একে একে আসতে শুরু করেছে। এমন সময় জমিদার বাড়ী থেকে বাবাকে ডেকে পাঠালো। তারপর বিকেলের দিকে খবর এলো বাবাকে জমিদার চোরকুঠ্‌রীতে আটক রেখেছে। কারণ গত দু'বছরের খাজনা বাকী।

পরেরদিন বিয়ে। সুতরাং এই অবস্থায় একদিনের মধ্যে দু'বছরের বাকী পড়া খাজনা জোগাড় করা সম্ভব নয়।

চোরকুঠ্‌রী থেকে ছাড়া পেয়ে পরদিন সকালে থমথমে মুখ নিয়ে বাবা বাড়ী ফিরে এলো। সারাটা দিন কারোর সঙ্গে কথা বললো না। বুকটা এক অজানা আশংকায় কেঁপে উঠলো সরমার। বাড়ীর সেই আনন্দের জোয়ারে হঠাৎ ভাঁটার টান পড়লো। তবু সরমা নিজেকে বোঝালো এমন কতো প্রজাকেই তো চোরকুঠ্‌রীতে আটক রাখে।

দিন গড়ালো অনেক আশা আশংকায়। লগ্ন এলো। সবাই পিঁড়িতে করে ওকে বয়ে নিয়ে এলো ছাঁদনাতলায়। লজ্জায় কিছুতেই তাকাতে পারে নি সরমা। কি করে তাকাবে? যে পুরুষটাকে প্রতিটি পাল-পার্বণে নিজে অভ্যর্থনা করছে, সে-ই আজ সামনে।

কিন্তু শুভদৃষ্টির সময় চমকে উঠলো। তারপর? তারপর বুঝলো কেন বাবাকে গতকাল চোরকুঠ্‌রীতে আটক রেখেছিল। বাবার সারাদিনের বিষণ্ণতা, মা'র লুকিয়ে কান্না। কিন্তু তখন যা হবার হয়ে

গেছে। অনেকে অবশ্য জমিদার বাড়ীর ছোট-বৌ হয়ে যাবার জন্যে ওর সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করেছে। কিন্তু তাদের কি করে বোঝাবে ওর অন্তরের কামনা! সরমা তো টাকা-পয়সা-কিছুই চায় নি। চেয়েছিলো অন্য আরেকটা পুরুষকে।

সারাটা রাত সরমা শুয়ে শুয়ে কেঁদেছে। বিজয় মুখুজ্যে যখন ওকে আদর করেছে, উপভোগ করেছে, ওর দেহ তা'তে এতোটুকু সাড়া দেয় নি।

পরদিন পাল্‌কিতে উঠতে গিয়ে দেখেছ বাবা কাঁদছে। আর সে কান্না ওর বুকে আরো বেশী কান্নার ঢল নামিয়েছে। তবু্ও মেয়ে; কি-ই বা করতে পারে পুরুষের ইচ্ছা বা লালসার কাছে ?

জানালার পাশ থেকে সরে আসে সরমা। রাত গভীর হয়েছে। নীরব রাত নিস্তব্ধে বয়ে চলেছে পলদার বিলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে। হাওয়ায় ভেসে আছে জলের গন্ধ।

আলমারী খুলে বোতলটা বার করে যতোখানি তরল আগুন পারা যায় গলার ভেতর ঢেলে দেয় সরমা। তারপর চাবিটা ঘরের একধারে ছুঁড়ে দেয়।

ও সবকিছু ভুলে যেতে চায়। ভুলে যেতে চায় পেছনের জীবন, চড়ুইটিপির মাটিতে ফেলে আসা দিনগুলো। আজকের নীরব রাত সবকিছু নীরব করে দিক্। পলদার বিলে ঢল নামুক, আর সেই ঢলে ভাসিয়ে দিক সর্বনাশা এই বাড়ীর প্রতিটি ইট-পাথর।

॥ নয় ॥

মেঘাই বাড়ী ফিরে দেখে কুসুম শুয়ে। মনে সন্দেহ হয়। কোনদিন তো ও আসার আগে শুয়ে থাকে না। তবে কি ওর শরীর খারাপ, নাকি ছোট বৌঠানের ডাকে মেঘাই গেছে বলে কিছু মনে করেছে। কিন্তু ও তো সে রকম মেয়ে নয়।

বাবা মারা যাবার পর থেকেই মেঘাই দিনের পর দিন নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সবাইকে জড়ো করে যথাসাধ্য প্রতিবাদ করা প্রভৃতি সাত পাঁচ কাজে জড়িয়ে পড়েছে। কুসুম এসব ব্যাপারে বাঁধা দেওয়া দূরে থাক্, নিজেই বলেছে, পুরুষ হয়ে যা ভালো বুঝবে করবে। ঘরের জন্যে তো আমিই আছি।

আসাননগরে কুঠি তৈরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেঘাইয়ের কাজও অনেক বেড়ে গেছে। ঝিনাইদহের মহেশবাবুর পরামর্শ নেওয়া, তিতু মীরের সঙ্গে প্রত্যেকটি ঘটনার ব্যাপারে যোগাযোগ রাখা, গ্রামের প্রতিটি কৃষককে তাদের স্বার্থ বোঝানো—এসব ব্যাপারে মেঘাইকে বাইরে বাইরেই কাটাতে হয়। তাই কুসুমই মুনিষদের জমির কাজ বোঝায়, কাজ ভাগ করে দেয়। সময় মতো খাজাঞ্চীখানায় লোক পাঠানো, গোলাতে ধান তোলা, পাট ঝাড়ানো সবই একা হাতে করে।

ঘরের কাছে এসে নীচু স্বরে মেঘাই ডাকে,– কুসুম।

কোন উত্তর না পেয়ে ঘরে ঢোকে। এক কোণে লণ্ঠনটা কমানো। মেঘাই এগিয়ে গিয়ে গিয়ে লণ্ঠনের শিখাটা বাড়িয়ে দেয়। মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়। কুসুম তো শুয়ে থাকার মেয়ে নয়। বেশ কিছুদিন ধরে মেঘাই সময় একেবারেই পায় নি। যেটুকুও বা পেয়েছে, তা' অন্য ভাবনা-চিন্তা করতেই কেটে গেছে। সংসারের দিকে নজর দিতে পারেনি।

মেঘাই এগিয়ে গিয়ে হাতটা কুসুমের কপালে রাখতেই কুসুম চমকে জেগে ওঠে। তারপর ওর দিকে ফিরে বলে,—তুমি!

কপালের ওপর হাত রেখেই মেঘাই জিজ্ঞাসা করে,—কী হয়েছে বলতো? শুয়ে রয়েছো যে?

কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থেকে কুসুম উত্তর দেয়,— বিকেলের থেকেই শরীরটা ভালো লাগছিলো না। তাই ভাবলাম একটু শুয়ে নি। তুমি আসার আগেই উঠে পড়বো। কিন্তু এমনই ঘুম এসে গেল যে খেয়ালই করি নি কখন বেলা পড়ে সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

কুসুম বিছানা ছেড়ে উঠতে গেলে মেঘাই বাধা দিয়ে জোর করে

ওকে শুইয়ে দেয়। তারপর, বলে,—তুমি শুয়ে থাকো। আমি নিজে নিয়েই খাবোখন।

কুসুম আবার শুয়ে পড়ে। মেঘাই বোঝে ওর শরীর নিশ্চয়ই খুব খারাপ। সামান্য অসুখে বিছানা নেবার মেয়ে ও নয়। কুসুমের গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করে মেঘাই, শরীর কি খুব খারাপ লাগছে বৌ? হর কব্‌রেজকে ডাকবো?

মাথা নেড়ে কুসুম উত্তর দেয়,—না। তোমার খাবার রান্নাঘরে ঢাকা দেওয়া আছে। রাত হয়েছে। খেয়ে এসো।

খাওয়া দাওয়া সেরে ঘরে ফিরে এসে দেখে ইতিমধ্যে কুসুম ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত মুখে অসুস্থতার ছাপ ফুটে উঠেছে। কেমন শান্ত দেখাচ্ছে। লণ্ঠনের একমুঠো আলো এসে পড়েছে ওর ঘুমন্ত মুখের একটা পাশে, গলায়, বুকের ওপর। অসহায় দেখাচ্ছে ওকে। সীমন্তে আঁকা সিঁদুরের টিপটা বিকেলে গা ধোওয়ার পর বেশ উজ্জ্বল করে এঁকেছে।

আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ওকে একেবারে বুকের কাছে টেনে নেয় মেঘাই।

০ ০ ০ ০

অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ একটু সকাল বেলাতেই ওঠে মেঘাই। মহেশবাবুকে আগেই খবর দিয়ে রেখেছে। নিশ্চয়ই এখনই এসে পড়বে। তিতু মীর লোক পাঠিয়েছে। নটবরকে ইচ্ছে করেই সঙ্গে নিয়েছে মেঘাই। এতোদূরের পথ। বিপদ-আপদ হ'তে কতোক্ষণ! তার ওপর আসান নগর নীলকুঠির জ্বলন্ত চোখ তো সব সময়ই ওর পেছু পেছু ফিরছে। ছোট বৌঠান অবশ্য আশ্বাস দিয়েছে মাঝে মাঝে লক্ষ্মীকে পাঠিয়ে খোঁজ খবর নেবে। তবু বৌঠানের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে পারে না। বড়ো লোকের খেয়াল—কখন কোন্ পথে চলে তার হদিশ পাওয়াই ভার। তাই হরবিলাসীকে বলেছে ও না ফেরা পর্যন্ত কুসুমের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে। আর গণপতি তো রয়েছেই আপদে বিপদে।

তবু মনটা খুঁত খুঁত করে। শরীরটাও ক'দিন ধরে ভালো যাচ্ছে

না। তবু যেতে হবে। কোলকাতার হরিশবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটা একান্তই দরকার। কাগজের লোক। সুতরাং নীলকুঠি সাহেবদের আগামী মেজাজ মর্জি তার পক্ষে অনুমান করা যতোটা সহজ, অন্য কারোর পক্ষে তা' সম্ভব নয়। এক একবার মনে হয় ঘরে অসুস্থা স্ত্রী, বৃদ্ধা মা'কে রেখে যাওয়া কি ওর পক্ষে ঠিক হচ্ছে? পর-মুহূর্তেই দ্বিতীয় অন্তর এতোগুলো লোকের দুঃখ দুর্দশা আর কান্নায় চঞ্চল হয়ে ওঠে।

খাল-বোয়ালিয়ায় নীলের চাষ পুরোপুরি সুরু হয়ে গেছে। ক'দিন আগেও ওখানকার গণেশ ঘোষালের সঙ্গে কথা হচ্ছিলো। ভালো ভালো সমস্ত জমিগুলো একেবারে শ্মশানে পরিণত হয়েছে। যারা কুঠির দাদন নিতে চাইছে না, তাদেরও জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে গিয়ে চোরকুঠ্রীতে দিনের পর দিন আটক রেখে দাদন নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। তারপর তাদের সবচেয়ে ভালো জমিগুলোতে খড়ির দাগ পড়ছে নীল বোনার জন্যে। গণেশই বলছিলো, খাল-বোয়ালিয়ার খালে যতো জল, তার চেয়েও নাকি বেশী জল জমা হয়েছে মানুষগুলোর চোখে। একবার কুঠি থেকে দাদন নিলে রায়তের সারাজীবনে শোধ করা তো দূরের কথা, মৃত্যুর পরও তাদের ছেলেমেয়েদের রেহাই নেই। তার ওপর আবার সুন্দরী স্ত্রী অথবা যুবতী মেয়ে বা বোন থাকলে তো কথাই নেই। কুঠিওয়ালাদের নজরে পড়লেই হলো। হয় তাকে নিজে থেকে রাত কয়েকের জন্য কুঠিতে পাঠাতে হবে, নইলে কুঠির লাঠিয়ালরা জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। আর সাদা মানুষগুলোর ক্ষুধা নাকি সহজে মিটতে চায় না।

কথাগুলো শুনে আর স্থির থাকতে পারেনি মেঘাই। কুসুমের অসুস্থতা, সংসারের চিন্তা কোন কিছুই ওকে বাঁধতে পারে নি। এখন থেকে সতর্ক না হলে আসাননগরের অবস্থাও খাল-বোয়ালিয়ার মতো হবে। না, এ মেঘাই কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। যে মাটিতে ওর জন্ম, তাকে শ্মশান হ'তে দেবে না। পারবে না গ্রামের মেয়েদের উপভোগের জন্য কুঠিতে পাঠাতে। যতোটুকু শক্তি ওর আছে, তা' দিয়েই ওকে প্রতিরোধ করতে হবে। মন থেকে অন্য সব চিন্তা মুহূর্তেই

ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে মেঘাই।

স্নান খাওয়া-দাওয়া সারতে সারতে মহেশবাবু, নটবর, খাল-বোয়ালিয়ার গণেশ ঘোষাল এসে উপস্থিত হয়। কুসুম আগেই জিনিষ পত্র গুছিয়ে রেখেছে। বলা তো যায় না, কোলকাতা অতো দূরের পথ। ক'দিন থাকতে হবে, আর কি সেখানে পাওয়া যাবে না যাবে কে জানে? কুসুম তো আর সঙ্গে থাকবে না যে চাইলেই হাতের কাছে এগিয়ে দেবে? যা মানুষ, হাতের কাছে তৈরী না পেলে হয়তো বা সময় মতো খাওয়া দাওয়াই করবে না। তাই যতোদূর সম্ভব সব-কিছুই গুছিয়ে দিয়েছে। বারবার মেঘাইকে কাছে ডেকে বুঝিয়েছে। তবু মন মানে নি।

নিজের শরীরের কথা কুসুম ভাবে না। মানুষটা যা আপনভোলা —একবার কোন কাজ নিয়ে মাতলে অন্য কোনদিকেই খেয়াল থাকে না। তবু মনকে বোঝায়, ওর একার জন্য সংসারের মধ্যে ও কেন ওর স্বামীকে বেঁধে রাখবে? যে মানুষটা আজ সবার জন্য, অনেকের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে, তাকে কেন এই সংসারের ছোট গণ্ডীতে বাঁধতে যাবে? কী অধিকার ওর আছে? সবার সুখ-দুঃখের সঙ্গে তো ওর সুখ-দুঃখও জড়িত। জড়িত, গ্রাম বাংলার আগামী ভবিষ্যত। সুতরাং অনেকের স্বার্থে কুসুমকে তো কয়েকদিনের বিচ্ছেদের বিরহ মেনে নিতেই হবে।

বাইরের ঘরে সবাই এসে অপেক্ষা করছে। দেরী করলে নিজেদেরই অসুবিধায় পড়তে হবে। দিনের বেলাতে গরুর গাড়ী যাবে; রাতে সামনে যে চটি অথবা গ্রাম পড়বে তা'তেই অপেক্ষা করবে। ঠগের ভয়ে রাতে পথ চলা বিপদ। তার ওপর নীলকুঠির লোক তো ওদের পায়ে পায়ে।

মেঘাই মাকে প্রণাম সেরে কুসুমের সামনে এসে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তারপর বুকের মাঝে টেনে নেয়। কুসুমও আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। কান্নায় ভেঙে পড়ে ওর বুকে। বিয়ের পর ওকে ছেড়ে এতোদূরে আর যায় নি মেঘাই। কুসুমও স্বামী ছেড়ে এতোদিন থাকে নি। মেঘাই একসময় ডাকে,—কুসুম!

কুসুম চোখ তুলে তাকায়।

— তুমি কাঁদছো ?

ওর কামিজে জল-ভরা চোখদু'টো মুছে নিয়ে বলে,—নাগো, কাঁদবো না। তবে এতোদূরের পথ তো তাই মন মানে না।

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে,—সাবধানে থেকো। আর তাড়াতাড়ি ফিরো।

ওর জল-ভরা চোখের ওপর নিজের দৃষ্টি রেখে, ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে মেঘাই বলে,—ঘরে এমন সুন্দরী বৌ রেখে বুঝি বেশীদিন থাকা যায় ?

—যাও, তুমি ভারি অসভ্য।

কুসুমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মেঘাই গরুর গাড়ীতে এসে ওঠে! মহেশবাবু, নটবর, গণেশ আগেই এসে বসে আছে। পায়রাডাঙা পেরিয়ে রানাঘাট হয়ে নৈহাটি। তারপর গঙ্গা পার হয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে সোজা একেবারে কোলকাতায়। পথে বিপদ আপদ না হলে তিন দিনের দিন ওরা কোলকাতায় পৌঁছে যাবে।

মেঘাই ভেতরে ভেতরে একটা উত্তেজনা অনুভব করে। এতোদিন শুধু নিজের গণ্ডীর ভেতরেই কৃষকদের সংঘবদ্ধ করেছে। কিন্তু এবার ঘর ছেড়ে, নিজের গ্রাম ছেড়ে বিদ্রোহের পথ খুঁজতে বেরিয়েছে বাইরের পৃথিবীতে।

এদিকে ওদিকে ইতিমধ্যেই বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। বড়োখালির রহিমউল্লা নীল-সাহেবমরেলের বিরুদ্ধে চাষীদের সুসংগঠিত করেছিলো। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারে নি। রাতের অন্ধকারে মরেল হিলি আর লাইট্ফুটকে সঙ্গে নিয়ে পুরুলিয়া যাবার ভান করে বড়োখালি আক্রমণ করে রহিমউল্লাকে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দিয়েছে। যুবকদের আটক করেছে চোরকুঠ্রীতে, আর যুবতীদের নিয়ে গেছে নিজেদের কুঠিতে। সেখানকার চাষীরা নাকি হঠাৎ এ ঘটনায় একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়েছে। আবার সংঘবদ্ধ করতে যে উদ্যমের প্রয়োজন তা'ও নাকি দুর্দান্ত নীলকর মরেল ভেঙে দিয়েছে।

মোল্লাহাটি কুঠির এ্যাসিষ্টেন্ট ম্যানেজার ক্যাম্পবেলকে মাঠের

ধারেই ফেলে রেখে গিয়েছিলো মরে গেছে ভেবে। আরেকজন এ্যাসিস্টেন্ট হাইড ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গিয়ে কোন রকমে প্রাণে বেঁচেছে।

ঝাউদিয়ার জমিদার করম আলি চৌধুরীর সঙ্গে স্থানীয় নীলকরদের নাকি সংঘর্ষ লেগেই রয়েছে। সেও এক টুকরো জমি দেবে না আর নীলকররাও ছাড়বে না। এই জমি নেওয়া নিয়ে পরপর কয়েকটা রক্তাক্ত লড়াই হয়ে গেছে। নীলকর আর্চিবল্ড হীলকে অবশ্য শেষ পর্যন্ত করম আলি চৌধুরীর লাঠিয়ালদের লাঠির কাছে মাথা নীচু করে পালাতে হয়েছে।

এইসব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঘটনা ওকে যেন এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেয়। রক্তে রক্তে বয়ে আনে নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উন্মাদনা। তবু মাঝে মাঝে কুসুমের কথা মনটাকে উতলা করে তোলে। একা কুসুম হয়তো বা রাতের বিনিদ্র শয্যায় শুয়ে ওর কথাই ভাবছে। এপাশ ওপাশ করছে। মনটা মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

সঙ্গী হিসেবে মহেশবাবুর সাহচর্য রীতিমতো আনন্দদায়ক। মানুষের জীবনটাই যেন কতোগুলো ঘটনার যোগফল! রোমাঞ্চকর সে সব অভিজ্ঞতা।

পথের দু'পাশে উঁচু-নীচু ফসলে ভরা ক্ষেত। প্রায় দিগন্তকে ছুঁয়েছে। গ্রাম বাংলার লাজুক বধূর সবুজ শাড়ীর আঁচল দিয়ে যেন অঙ্গ ঢাকা। কোমল, নরম, নত-মুখী। সেই ফসলের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে আঁকা-বাঁকা পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে ওদের গরুর গাড়ী।

মাঝে মাঝে মেঘাই এসে মহেশবাবুর পাশে বসে। শোনে, ওর জীবনের দিনগুলোর কথা। প্রথম জীবনে নীলকুঠির দেওয়ান। তার পরে নাড়াইলের দুর্দান্ত জমিদার রামরতন রায়ের নায়েব। আর এখন? সাধারণ চাষীদেরই একজন। ভাবতেও কেমন আশ্চর্য লাগে। একটা জীবনে এতো বিপরীত বৈচিত্র আসে কি করে?

রাস্তায় গরুর গাড়ী থামিয়ে নিজেরাই পথের ধার-পাশ থেকে কাঠকুটো সংগ্রহ করে রান্না করে নেয়। গ্রামের ভেতরের কোন পুকুরে স্নানটা সারে। খাওয়া দাওয়া সেরে আবার শুরু হয় ওদের পথ

পরিক্রমা। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এলে জায়গা নেয় সামনে যে গ্রাম পড়ে, সেই গ্রামেরই কোন গৃহস্থ বাড়ীতে।

মাঝে মাঝে সংসারের ভাবনা, গ্রামের অবস্থা, কুসুমের শরীরের কথা ওকে চঞ্চল করে তুললেও দিনগুলো মোটামুটি মেঘাইয়ের মন্দ লাগে না। সময় পেলেই মহেশবাবুকে ঘিরে ধরে। মহেশবাবু বলে, —জানিস মেঘাই, গাঁয়ে নীলকর এসে কুঠি বানাতেই কুঠিতে দেওয়ানীটা জুটে গেল। ছোটবেলায় পাঠশালায় হিসেবপত্র রাখার জন্য যে শুভংকরী শিখেছিলাম, মোটামুটি সেটাই কাজে লেগে গেল।

আরামের চাকরী। বসে বসে শুধু সাহেব সুবোদের মর্জিমাফিক আদেশগুলো মেনে প্রজাদের ওপর যতোটা পারা যায় অত্যাচার করা। রায়তদের ভালো ভালো জমি বেছে খড়ি দিয়ে নীলচাষের জন্য দাগ মারা, কুঠিতে নীল এনে ওজনটা কম করে দেওয়া। আর সবচেয়ে বড়ো কথা রায়ত যেন কোন রকমেই দাদন শোধ দিতে না পারে সেই দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা।

দিনগুলো মোটামুটি ভালই কেটে যাচ্ছিলো। রাতের অন্ধকারকে আলোয় আলোয় দিন বানিয়ে কুঠির ভেতরে সাহেব মেমগুলোর হাত ধরাধরি করে নাচ, গান আর মাতলামী চলতো। সব সময় ভালো না লাগলেও খারাপ লাগতো না।

গাঁয়ের বয়স্থা মেয়ে অথবা সুন্দরী বৌদের খোঁজখবর জোগাড় করার জন্য কুঠিতে লোক থাকতো। আমায় শুধু রাতের অন্ধকারে ওদের কুটিতে আনার ব্যবস্থা করতে হ'তো। তা' সে মেয়ে যদি স্বেচ্ছায় না আসে, তবে লাঠিয়াল পাঠাও। অনেক সময় অবশ্য এতো কষ্ট করতে হ'তো না। কুঠির কর্মচারীরা নিজেরাই নিজেদের বোন-বৌদের ভুলিয়ে ভালিয়ে এনে তুলতো কুঠিতে। কুঠি-ম্যানেজারের নেক্‌নজরে পড়ার জন্য। তা' সেই কুঠিতেই হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে গেল।

কিছুদিন থেকেই শুনছিলাম আমাদের কুঠির মালিক হোমে অর্থাৎ বিলেত যাবেন। শেষে সত্যি একদিন গেলেন। মাস ছয়েক নিজের দেশে ছুটি কাটিয়ে ফিরে এলেন আবার ইণ্ডিয়ায়। বাংলাদেশে। তবে একা নয়। সঙ্গে নিজের মেম আর মেয়ে জ্যাক্‌লিনকে নিয়ে।

প্রথম ইণ্ডিয়াতে আসার সময় স্ত্রীকে সঙ্গে আনতে পারেন নি। কারণ নিঃসম্বল অবস্থায় নিজে নেমেছিলেন মাদ্রাজ উপকূলে। তারপর অনেক ঘাট ঘুরে বাংলাদেশে এসে স্থিতু হলেন। তবু এই গরীব আর ম্যালেরিয়ার দেশে স্ত্রী মেয়েকে আনতে ভরসা পান নি। শেষ পর্যন্ত ভাগ্যের চাকা ঘুরলো। কিছু টাকা জোগাড় করে নীলের চাষ শুরু করলেন। কালো অশিক্ষিত মানুষগুলোকে কখনো ভয় দেখিয়ে আর কখনো বা তাদের সরল বিশ্বাসকে ঠকিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই কয়েকটা কুঠির মালিক হয়ে বসলেন। টাকার সঙ্গে সঙ্গে কুঠির পাশে বিলেতি ছাঁদে কটেজ তৈরী হলো। আরামের সমস্ত রকম উপকরণও এলো।

কিন্তু আশ্চর্য হয়েছিলাম সেই ব্রাউন সাহেব অথবা তার মেমকে দেখে নয়। ওরা তো করবেই। ব্যবসায়ীর জাত। ব্যবসা করতেই তো এই সাত সাগর আর তের নদী পেরিয়ে আমাদের দেশে এসেছে। অবাক হয়েছিলাম ওর মেয়েটাকে দেখে। ফুটফুটে। যেন সদ্য ফোটা একটা রক্তিম গোলাপ। সোনালী চুল। ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা। টানা টানা আয়ত দুটো চোখ। আকাশের মতো নীলাভ। আর তেমনি চরিত্র। কুঠির মানুষগুলোর সঙ্গে যেন এতোটুকু মিল নেই। দেওয়ানী করতে করতে তো দেখেছি কম নয়। মাতাল লম্পট স্বামীর ঘরে নিজে না গিয়ে কুঠির গোমস্তাদের দিয়ে গাঁয়ের কোন মেয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে এ দৃশ্যও আমি নিজের চোখেই দেখেছি। কিন্তু জ্যাকৃলিনকে দেখলাম সম্পূর্ণ আরেকরূপে।

বাংলাদেশের শস্যশ্যামল স্নিগ্ধতা, শরতের সুনীল আকাশ আর মানুষগুলোর সরলতা—এইগুলোই যেন মেয়েটার মন কেড়ে নিয়েছিলো। কতোদিন নিজে হাতে চোরকুঠ্রির দরজা খুলে দিয়েছে। খবর পেয়ে বাবা ডেকেছে—জ্যাকি! বাবার সামনে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছে জ্যাকৃলিন। একটা কথাও বলে নি। কিন্তু পরে আবার সেই কাজই করেছে। রাত গভীরে মাতাল ম্যানেজারের ঘর থেকে মেয়েদের উদ্ধার করে নিজে সঙ্গে গিয়ে গ্রামে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। কতোদিন কুঠিতে আসবার সময় দেখেছি, কোন পুকুর বা ঝিলের ধারে বসে বসে জ্যাকৃলিন গাঁয়ের মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছে, অথবা সেই

ঝিলের কাক-চোখ স্বচ্ছ জলে নিজেকে দেখছে। ধীরে ধীরে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। ডেকেছি,—জ্যাক্‌লিন!

আমার ডাকে অবচেতনা ভেঙে ও ফিরে তাকিয়েছে। জিজ্ঞাসা করেছি,—কী এতো ভাবছিলে?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছে, জানো মিষ্টার চাটার্জী, তোমাদের দেশের মানুষগুলোর কথা ভেবে সত্যি আমার কষ্ট হয়, যে এদের দুঃখের জন্য আমরা যতোখানি দায়ী, তার চেয়ে অনেক বেশী দোষী তোমাদের দেশের মানুষগুলোই। এদের নিছক লোভ, ক্ষুদ্রতা আর স্বার্থপরতাই এদেশের দুঃখের মূল কারণ।

সত্যি বলতে কি, অতোটুকু মেয়ে জ্যাক্‌লিন আমার চেয়েও এদেশটাকে অনেক বেশী ভালবাসতো। কাছে পেতে চাইতো। ওর সামনে দাঁড়িয়ে আমারই লজ্জা করতো।

মহেশবাবু চুপ করে কি যেন ভাবে।

মেঘাই জিজ্ঞাসা করে,—তারপর?

—খাজনা দিতে না পারায় সেই গ্রামেরই একটা ছেলেকে চোর-কুঠ্‌রীতে আটক রাখা হয়েছিলো। ওর বৌকে সেই সাহেবের ঘরে জোর করে রাত কাটাতে পাঠানো হ'তো।

শেষে একদিন দেখা গেল, ছেলেটার সঙ্গে জ্যাক্‌লিনও উধাও। পরে জেনেছিলাম, সেই ছেলেটা আর জ্যাক্‌লিন নাকি মাদ্রাজে গিয়ে ধর্ম বদলে ঘর বেঁধেছে। খুসীই হয়েছিলাম খবরটাতে। যে ঘর ওর বাবা ভেঙে দিয়েছিলো, সেই ঘরই মেয়েটা আবার জুড়ে দিলো।

আর ব্রাউন? খোঁজ পেয়ে অনেক চেষ্টা করেছিলেন মেয়েকে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু জ্যাক্‌লিন ততোদিনে বাঙালী ঘরের গৃহস্থ বধূ। তাই ব্রাউন সাহেব পাশের গাঁয়ের নীলকরদের কাছে কুঠি বিক্রী করে দিয়ে ফিরে গেলেন গেলেন হোমে।

আমি হলাম বেকার। কিছুদিন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালাম। শেষে নীলকুঠির কিছু অভিজ্ঞতা ছিলো বলে জমিদার রামরতন রায় তাঁর নায়েব করে নিলেন। কিন্তু মনে একটা মুহূর্তের জন্যও শান্তি পাই নি। প্রতি মুহূর্তে ভেবেছি জ্যাক্‌লিন একজন বিদেশিনী হয়েও

কতো সহজে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের ভীড়ে মিশে যেতে পারলো। আর সেই দেশের মানুষ হয়েও আমি তা' পারলাম না।

দিনরাত সেই জ্বালায় জ্বলতাম। কুঠির দেওয়ান হয়ে সাহেবদের যে রূপে দেখেছি, জমিদারের নায়েব হয়ে দেখলাম, এরাও সেই একই। ওদেরই মতো এরাও জীবনকে উদ্দাম উপভোগ করে। তবু ওদের বেলায় মনকে সান্ত্বনা দেওয়া যায়। এতোগুলো সাগর আর নদী পেরিয়ে সম্পূর্ণ অন্য আবহাওয়ায়, আত্মীয়স্বজনহীন বিদেশে এসেছে টাকা রোজগারের আশায়।

কিন্তু এরা? এদেশের মানুষ হয়েও দেশের মানুষগুলোর ওপরেই অকথ্য অত্যাচার করে পয়সা আদায় করে। আর সেই পয়সা প্রতি সন্ধ্যায় আলো-আঁধারির সঙ্গমে ঢালে বেনারস অথবা কোলকাতা থেকে আসা বাইজীদের পায়ে। নিজের প্রতিই ধিক্কার এলো। তাই শেষ পর্যন্ত নায়েবগিরি আর করতে পারলাম না। সব ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে চলে এলাম নিজের গ্রাম দামুরহুদায়।

নৈহাটিতে ফেরী পার হয়ে মেঘাইরা এপারে এসে দেখে পাগলাটা বসে। তড়িঘড়িতে ফাদার বমভাইটিসকে কোলকাতা আসার খবর দেওয়া হয়ে ওঠে নি। কুসুমও হয়তো বা চিন্তা করছে। তাই পাগলটাকে ডেকে মেঘাই কয়েকটা পয়সা দিয়ে আসাননগরে কুসুমকে আর কেষ্টনগরে গিয়ে ফাদারকে খবর দিতে বলে।

মনটা হাল্কা হয়। বাড়ী থেকে বেরিয়েই মনটা খুঁতখুঁত করছিলো। ফাদারকে ওদের কোলকাতায় যাওয়ার খবর জানানো উচিত ছিলো। কিন্তু তাড়াতাড়িতে আর সময় পেয়ে ওঠে নি। আসাননগরেরও কেউ ইতিমধ্যে সদরে যায়নি যে তার সঙ্গে খবরটা পাঠিয়ে দেবে। আর কুসুমও নিশ্চয়ই খুব ভাবছে। খবরটা পেলে তবু কিছুটা নিশ্চিন্ত হবে।

নিজের ভেতরেও একটা চাঞ্চল্য অনুভব করে মেঘাই। নৈহাটির গঙ্গা পেরিয়ে একটু এগোলেই কোলকাতা।

মহেশবাবু কুঠি আর জমিদারীর খাজনা দিতে অনেকবার

কোলকাতায় গেলেও মেঘাই কোনদিন আসে নি। তবে লোকের মুখে শুনেছে কতো বড়ো শহর। চওড়া রাস্তা, আকাশ ছোঁয়া পাকা বাড়ী আর ল্যাণ্ডো-ফিটনের ছোটাছুটি। শুনতে শুনতে রহস্যময় কোলকাতা যেন আরো রহস্যে ভরে উঠতো।

শহর বলতে মেঘাই একমাত্র দেখেছে কৃষ্ণনগর। কোলকাতার তুলনায় সেই কৃষ্ণনগর নাকি কিছুই নয়।

বিয়ের আগেও মেঘাই অনেকবার ভেবেছে কোলকাতা দেখতে আসবে। কিন্তু হয়ে ওঠেনি। কোন সময় উৎসাহ থাকলেও টাকা খরচের জন্য সঙ্গী পায়নি! আর কখনো বা সঙ্গী পেলেও সুযোগ হয়ে ওঠে নি। এতো দূরের পথ। যাবো বললেই তো আর যাওয়া হয়ে ওঠে না।

ওদের গাঁয়ের রতনকাকা পাল্‌কি নিয়ে কতোবার কেলেকাতায় গেছে। চণ্ডীমণ্ডপে বসে তামাক খেতে খেতে রতনকাকা সে-সব গল্প বলতো। শুনতে শুনতে মেঘাইয়ের মনে তীব্র হয়ে উঠতো কোলকাতা দেখার স্বপ্নটা। বিয়ের পর কতো রাতে শুয়ে শুয়ে রতনকাকার মুখে শোনা গল্প কুসুমকে বলেছে। আর বলেছে,—জানো একবার যাবোই কোলকাতায়।

কুসুম ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলেছে,—কেন গো?

—এমনি। কতো বড়ো শহর। লোকজন, বিরাট বিরাট সব রাস্তাঘাট। রতনকাকার মুখে শোনা গল্পের ওপর আরো কয়েক পোচ রঙ চড়িয়েছে মেঘাই।

কুসুমও মেঘাইয়ের কথায় কৌতুহলী হয়ে উঠতো। মন দিয়ে শুনতো ওর বলে যাওয়া রতনকাকার গল্প। সরল দু'টো ডাগর চোখে ফুটে উঠতো অপার বিস্ময়। তারপর মেঘাইকে জড়িয়ে ধরে বলতো,—নাগো, আমায় একা ফেলে তোমায় আমি কিছুতেই যেতে দেবো না।

নৈহাটির গঙ্গায় স্নান করে খাওয়া দাওয়া সেরে রাত কাটিয়ে ভোরের সূর্য আকাশে দেখা দিতেই মেঘাইরা আবার যাত্রা শুরু

করে। কোলকাতা যতো এগিয়ে আসে, মনের ভেতরে ততো উত্তেজনা বাড়ে। মহেশবাবু না হয় অনেকবার কোলকাতায় এসেছে, কিন্তু মেঘাই ? প্রতি মুহূর্তে মনটা উন্মুখ হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যের মুখোমুখি মেঘাই, মহেশবাবু, নটবর আর গণেশকে নিয়ে গরুর গাড়ীটা গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোডের একপ্রান্তে এসে পৌঁছোয়। মারাঠা ডিচের কাছে।

মেঘাই অবাক হয়ে মহেশবাবুর কাছ থেকে শুনেছিলো যে মারাঠা দস্যু অর্থাৎ বর্গীদের হাত থেকে শহরটাকে রক্ষার জন্য নাকি শহরবাসীরাই সবাই মিলে খালটাকে কেটেছিলো। কোলকাতার নামকরণ সম্পর্কেও পাঠশালার পণ্ডিতমশায়ের কাছে অনেক গল্প শুনেছিলো মেঘাই।

কালিঘাটের কালি মন্দিরের থেকেই নাকি সুতানুটি, গোবিন্দপুরের নাম হয়েছিলো কোলকাতা। অথবা, মাদ্রাজের উপকূল-শহর কলিকটের প্রতিধ্বনি করেই শহরটার নাম রাখা হয়েছিলো কোলকাতা। কই, আসাননগর অথবা কেষ্টনগর সম্পর্কে তো এতো কথা শোনে নি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নাম অনুসারেই তো শহরটার নাম হয়েছে কৃষ্ণনগর। অবশ্য কোলকাতা আর কেষ্টনগরের মধ্যে তুলনা করাটাও বোকামী।

দিন শেষ হয়ে আসছে। পড়ন্তবেলা মারাঠা ডিচে্র জলের ওপর সিঁদুরের আভাস ছড়িয়েছে। ওপারে সন্ধ্যার প্রথম লগ্নের-ধূসর অস্পষ্টতায় এতোদিনের কল্পনার শহর কোলকাতা। মাত্র বছর ছয়েক আগে এ শহরের উপকণ্ঠ ব্যারাকপুর থেকে সুরু হয়েছিলো সিপাহী বিদ্রোহ। আর স্যার এডোয়ার্ড পেজেট ব্যারাকপুরের বাগানে সার সার কামান বসিয়ে তোপের মুখে শায়েস্তা করেছিলো হাজার কয়েক বিদ্রোহীকে। ইংরেজ বিদ্রোহ বললেও আসলে এটা মুক্তিযুদ্ধ। প্রবল পরাক্রম ইংরেজের বিরুদ্ধে অসন্তোষের জেহাদ। গ্রামে গ্রামে ছোট বড়ো সবার মুখে এই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বাঁধা ছড়া মেঘাই শুনেছে। এই মুক্তিযুদ্ধের নেতা মঙ্গল পাণ্ডের বীরত্বের কাহিনী ফাঁসির ঘটনা। মনে মনে শ্রদ্ধা করেছে মঙ্গল পাণ্ডেকে। মুক্তিযুদ্ধের বারাণসী ব্যারাকপুর।

পরদিন দুপুরের আগেই ওরা হিন্দু পেট্রিয়টের অফিসে আসে।

শহরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে পত্রিকার অফিসটা।

হিন্দু পেট্রিয়ট্ পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখার্জীকে দেখে প্রথমেই বেশ ভালো লাগে মেঘাইয়ের। অল্প বয়েস, সৌম্য-শান্ত মূর্তি ; আইন সম্পর্কে নাকি অগাধ জ্ঞান। এমনকি ইংরেজরা পর্যন্ত এই কারণে তাকে রীতিমতো সমীহ করে চলে। তবু গরীব চাষীদের প্রতি কি প্রচণ্ড দরদ।

মহেশবাবু একে একে সবার সঙ্গে হরিশবাবুর পরিচয় করিয়ে দেয়। হরিশবাবু ওদের বসতে বলে কুশল জিজ্ঞাসা করে। পথে আসতে কোন কষ্ট হয়েছে কিনা জানতে চায়। তারপর কুঠির খবর, বর্তমান চাষ-বাস, চাষীদের অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করে। কথাবার্তায় বুঝতে অসুবিধা হয়না যে অত্যন্ত দৃঢ়চেতা মানুষ। মহেশবাবুর কাছ থেকে দামুরহুদার বিস্তারিত খবরাখবর নেয়। তারপর মেঘাইকে বলে,—এর আগে কোলকাতায় কখনো এসেছো ?

মেঘাই উত্তর নেয়,—না।

—কোলকাতা কেমন লাগছে ?

একটু চুপ করে থেকে মেঘাই বলে,—এখনো তো কিছুই দেখি নি।

ওর সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে হরিশবাবু মহেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করে,—আপনি কোথায় উঠবেন ?

মহেশবাবু উত্তর দেয়,—আমার এক আত্মীয় ফোর্ট উইলিয়মে চাকরী করে। ভাবছি তার ওখানেই উঠবো। থাকাও হবে আর ওদের সম্পর্কে যতোটা পারা যায় খবর নেওয়া যাবে।

—হ্যাঁ, সে তো ভালো কথা। কিন্তু এদের থাকার কিছু ব্যবস্থা করেছেন ?

মহেশবাবু মেঘাইয়ের দিকে তাকায়। তারপর বলে,—ভাবছি এদের জন্য সস্তায় যদি কোন চটি পাওয়া যায়।

ওদের কথার মাঝখানেই ঘরের ভেতরের পর্দাটা কয়েকবার দুলে ওঠে। চুড়ির রিনিঠিনি আওয়াজ আসে। মেঘাই এর সঙ্গে পরিচিত। ঘরের ভেতরে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় ব্যস্ত থাকলে কুসুমও ওকে এইরকম ইসারা ইঙ্গিতেই ডাকে।

হরিশবাবু ওদের বসতে বলে ভেতরে যায়। অস্পষ্ট কিছু কথা ভেসে আসে। তারপর হরিশবাবু ঘরে ঢুকে মহেশবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে,—মহেশবাবু, আমার স্ত্রী বলছিলেন, এরা আর কোথায় চটি খুঁজতে যাবে? আমার এখানেই থাকুক। দিনমানে ঘুরে ঘুরেই শহর কোলকাতা দেখবে। শুধু রাতটুকুরই তো মামলা। তা' এই পত্রিকার অফিসেই না হয় কাটিয়ে দেবে। কেমন? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে,—তা'হলে তোমরা স্নানটান করে দুপুরের খাওয়া সেরে নাও। রামলাল পিয়নকে বলে যাচ্ছি, যতোটা পারে তোমাদের যেন শহরটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেয়। আমাকে এক্ষুণি বেরোতে হবে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসানের জরুরী একটা সভা আছে। তারপর মেঘাইয়ের দিকে ফিরে বলে, মেঘাই, তোমাদের শাসাননগরের কুঠির কথাও তুলবো এ্যাসোসিয়েসানের সভায়। হরিশবাবু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান।

কতো বড়ো আইনজীবি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসানের সেক্রেটারী, কিন্তু এতো সহজ সরল আর আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার যে ভাবতেও অবাক লাগে। মুহূর্তেই মানুষটাকে যেন অতি আপনার জন বলে মনে হয়। মনে হয়, কতোদিনের চেনাশোনা নিকটতম বন্ধু।

হরিশবাবু বেরিয়ে যাওয়ার পর ভেতর বাড়ী থেকে তেল, গামছা আসে। মেঘাইরা স্নান সেরে নেয়।

খেতে বসে লক্ষ্য করে খাবার জিনিষ বাড়ীর ঝি এগিয়ে দিলেও পর্দার পেছন থেকে হরিশবাবুর স্ত্রী প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি নজরে রাখছে। মাঝে মাঝে ঝিয়ের মাধ্যমে কাউকে কোন রান্না বেশী করে নিতে বলছে। শ্রদ্ধায় মেঘাইয়ের মনটা ভরে ওঠে। ঠিক একেবারে কুসুমের মতো। কোন পাল-পার্বণ উপলক্ষে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করলে কুসুমও সামনে আসে না। দরজার আড়াল থেকে দেখাশোনা করে। কিন্তু ও তো গেরস্থ ঘরের বৌ, আর হরিশবাবুর তো দেশজোড়া খ্যাতি। কিন্তু তবু এরা যেন এক, অভিন্ন। এই মুহূর্তে মেঘাইয়ের তাই মনে হয়।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে মহেশবাবু ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আত্মীয়ের বাড়ীতে যায়। মেঘাই ভেবেছিলো, দুপুরে একটু গড়িয়ে নেবে। কিন্তু তা' আর হয়ে ওঠে না। একে হাতে সময় কম, তায় এতো কাজ। কুসুমও বাড়ীতে একেবারে একলা। পুরুষ বলতে তো কেউ নেই। ছোট বৌঠান মাঝে মাঝে লক্ষ্মীকে পাঠিয়ে খবরাখবর নেবে বলেছে, এই যা ভরসা। তবু মনটা চঞ্চল হয়। গ্রামের বর্তমান অবস্থা কেমন কে জানে ?

রাস্তায় আসতে আসতে শুনেছে এখানে ওখানে ইতিমধ্যেই নীলকর আর চাষীদের মধ্যে ছোটখাটো সংঘর্ষ সুরু হয়ে গেছে। চব্বিশ পরগণার তিতু মীর নাকি রীতিমত তোড়জোড় সুরু করেছে। প্রয়োজন হলে সমস্ত শক্তি নিয়ে নীলকরদের বিরুদ্ধে নামবে। নীলকররাও মুখ বুজে বসে নেই। নদীয়া আর যশোরের জমিদার লতাফৎ হোসেনের এলাকার কাঁচিকাটা আর সিঁদুরিয়ায় কুঠি করার জন্য তিনশো লাঠিয়াল নিয়ে কাছারি আক্রমণ করেছে। জোর করে বাধ্য করেছে মাথা-উঁচু করা জমিদারের রায়তদের নীল বুনতে। ওদের শক্তি বাড়তে বাড়তে এমন এক জায়গায় এসে ঠেকেছে যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটরাও ওদের যথেষ্ট সমীহ করে চলে। আর করবেই বা না কেন ? দিনের আলোতে আদালতে বিচারকের চেয়ারে বসলেও সন্ধ্যার অন্ধকারে কুঠিতে ভীড় করে নাচ-গান আর খানাপিনার জন্য। আর বেশীর ভাগেরই তো মেমসাহেব হোমে। সুতরাং রাতের জন্য মেয়েছেলেও দরকার। আর তার জোগান একমাত্র সম্ভব নীলকরদের মাধ্যমে। যাকে চোখে লাগে, বলে দিলেই হলো। ঠিক রাত্রে পৌঁছে যাবে।

চওড়া পাকা রাস্তা, বিরাট বিরাট বাড়ী, ছুটন্ত ল্যাণ্ডো-ফিটন আর হাত ধরাধরি করে পথ-চলা সাহেব মেম—সবকিছুই মেঘাইয়ের চোখে নতুন ঠেকে। মনের ভেতরে একটা ঈর্ষাও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সাত সাগর আর তের নদীর ওপারের মানুষগুলোর বিলাসিতা যেন অসহ্য।

মার্কুইস্ অফ্ ওয়েলেসলীর তের লাখ টাকা ব্যয়ে তৈরী লাটের বাড়ী ; বাংলার শেষ নবাব সিরাজদৌল্লার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য ভারতবর্ষে প্রথম ইংরেজ দুর্গ ফোর্ট উইলিয়াম—দিনের বেলাটা এইসব দেখতে দেখতেই কেটে যায়। রাত্রে আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে হরিশবাবু এই শহর গড়ে ওঠার ইতিহাস বলেন। শুনেও যেন কথা-গুলো বিশ্বাস হ'তে চায় না। গল্প বলে মনে হয়। রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে চার হাজার লোককে খরচ বাঁচাবার জন্য গ্রাম থেকে ধরে এনে ক্লাইবের আদেশে লাটের বাড়ী তৈরীর কাছে জুতে দেওয়া হয়েছে। ম্যালেরিয়া আর উপবাসে জীর্ণ দেহগুলো হাঁপাচ্ছে। অথবা, বাংলার শেষ নবাবের সৈন্যরা গঙ্গার ওপারে দাঁড়িয়ে, আর এপারে ভয়ে কোলকাতার সমস্ত ইংরেজ সপরিবারে গিয়ে জড়ো হয়েছে ফোর্টের ভেতরে। হরিশবাবুই বলেছিলেন, আঠারো'শ সাতান্ন সালের উনত্রিশে মার্চ যখন ব্যারাকপুরের এতো বছরের সিপাহী ব্যারাকে হঠাৎ মুক্তিযুদ্ধের লেলিহান শিখাটা জ্বলে উঠেছিলো, তখন কোলকাতার সমস্ত ইংরেজ বৌ-বাচ্চা নিয়ে আবার এই দুর্গের ভেতরেই আশ্রয় নিয়েছিলো।

মাঝে মাঝে মেঘাই লাটভবন পেরিয়ে ফোর্ট উইলিয়ামের পিছন দিকে গঙ্গার ধার ঘেঁষে এসে বসে। একমনে দেখে গঙ্গার বুকে দাঁড়িয়ে থাকা ইংল্যাণ্ড থেকে আসা বড়ো বড়ো পাল তোলা জাহাজ-গুলোকে। গঙ্গার ওপারে সূর্যদেব অস্ত যায়। তার শেষ রঙ আবির মাখায় গঙ্গার ঘোলা জলে। ডিঙিগুলো ঢেউয়ের তালে তালে দোল খায়। দুর্গ থেকে ভেসে আসা সৈনিক-মার্চ-পাষ্টএর গান—মনটাকে উদাসীন করে দেয়।

মনে পড়ে যায় কুসুমকে ; নিজের দেশের মানুষগুলোকে। সামনের পালতোলা জাহাজে এতোগুলো সাগর পাড়ি দিয়ে এসে কতোগুলো সাদা চামড়ার মানুষ ওদের ভাগ্যকে আজ কেড়ে নিয়েছে। মনটা ওদের বিরুদ্ধে ঘৃণায় ভরে ওঠে। রক্তে রক্তে প্রতিরোধের তীব্র আকাংখা জাগে।

সাহেবপাড়া, লালদীঘি, ডালহৌসির সেণ্ট জন চার্চ প্রভৃতি দেখার

মতো জিনিষ সবই দেখা হয়ে গেছে। হরিশবাবুর সঙ্গেও যা প্রয়োজন ছিলো ফুরিয়েছে।

মহেশবাবু ক'দিন পরে পাল্‌কিতে দামুরহুদায় ফিরবে। তাই মেঘাইরা দলবেঁধে গরুর গাড়ীতে যাবে। তবে তার আগে কালিঘাটে মায়ের মন্দিরে যেতেই হবে। কুসুম বারবার বলে দিয়েছে। মেঘাইয়ের নিজের ইচ্ছেও কম নয়। কোলকাতায় এসে কালিঘাটে পূজো দিয়ে না গেলে যে কোলকাতায় আসাটাই বৃথা। আর তার ওপর এতোদূরের পথ। জীবনে যে আবার কখনো আসা হবে তার-ই বা নিশ্চয়তা কোথায়!

হিন্দু পেট্রিয়ট্ পত্রিকার অফিস থেকে কালিঘাট শহরের আরেক প্রান্তে। দক্ষিণে শহর তেমন একটা বাড়ে নি। সাহেব সুবোরা থাকে চৌরঙ্গী ঘিরে, আশে পাশের অঞ্চলে। আর ধনী বাঙালী প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত দেব, হাটখোলার দত্ত প্রভৃতি সবাই থাকে শহরের উত্তর দিকে।

সন্ধ্যের পর শহরের দক্ষিণদিকে চলাফেরা করা যায়না। জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে থাকে ঠগী অথবা বেকার গোরা সৈন্যের দল। পূজো দিতে যাবার বা আসার সময় সুযোগ পেলেই পথিককে প্রাণে মেরে যা কিছু থাকে কেড়ে নেয়।

হরিশবাবুর কাছ থেকে ভালো করে পথঘাট জেনে নিয়ে মেঘাইরা চৌরঙ্গীর ওপর দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে ফোর্ট উইলিয়ামের সামনের মাঠটা পার হয়ে কালিঘাটে এসে পৌঁছোয়। গঙ্গায় স্নান করে। পিতৃতর্পণ শেষ করে মন্দির প্রাঙ্গণের ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে ডালি কিনে পুজো দেয়। মনে অনুভব করে শুচিস্নাতা একটা অনুভূতি। কুসুমের এতোদিনের শখ কালিঘাটে পূজো দেবার, আজ এতোদিন পরে মেঘাই তা' মেটাতে পেরেছে। তবু মনের কোণে একটু খচ্‌খচ করে। এ সময় কুসুম পাশে থাকলে কতো খুসী হ'তো। আর পুজারিণীর সাজসজ্জায় ওকে যা সুন্দরী দেখায়।

বিয়ের আগে শিবনিবাসের ঘাটে পুজারিণীর বেশেই ওকে দেখছিলো মেঘাই। বিয়ের পরও ওর মঙ্গল কামনা করে মন্দিরে

গেছে পূজো দিতে। ফিরে এসে মাথায় ছুঁইয়েছে সে প্রসাদী। লালপাড় গরদ, বড়ো করে আঁকা কপালের মাঝখানে সিঁদুরের টিপ আর শাঁখায় কুসুমের রূপ যেন আরো বেড়ে যায়। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে মেঘাই কুসুমের সেই রূপের দিকে। অবাক হয়ে দেখে ওকে, পবিত্রতা, স্নিগ্ধতার প্রতিমূর্তি সেই কুসুমের সঙ্গে প্রতিদিনের চেনা কুসুমকে যেন খুঁজে পায় না। অনেক দূরের মানুষ বলে মনে হয়।

পূজো সেরে প্রাঙ্গণের পাশের সারি সারি দোকানগুলো থেকে কুসুমের জন্য সিঁদুর কেনে। রেশমী চুড়িগুলো দেখে লোভ সামলাতে পারেনা। মনে পড়ে হাটবার এলেই কুসুম রেশমী চুড়ির জন্য আবদার করতো। সংসারের দু'চারটে টুকিটাকি জিনিষও সঙ্গে নেয়। বেলা পড়ার আগেই পত্রিকা অফিসে যেতে হবে। কাল ভোর সকালেই আবার বেরিয়ে পড়বে। সুতরাং আজ রাতটা বিশ্রামের প্রয়োজন। এতোদিনের ইচ্ছে পূরণ হওয়ায় মনটা তৃপ্তিতে ভরে ওঠে।

হরিশবাবুর সঙ্গে আলোচনা করে মেঘাই বুঝতে পারে সারা দেশ জুড়ে একটা চাপা অসন্তোষ ধিকিধিকি জ্বলছে। সুযোগ পেলেই বেরিয়ে আসবে। ক'বছর আগেকার সিপাই বিদ্রোহের আগুনটা কামানের গোলা দিয়ে চাপা দিলেও শিখাটা একেবারে হারিয়ে যায় নি। নীলচাষকে ঘিরে আবার সেই শিখাটাই যেন লেলিহান হবার অপেক্ষায় রয়েছে।

হ্যাঁ, ওর ধমনীতেও বইছে সর্দারের রক্ত। এক পূর্বপুরুষ মহিম সর্দারকে পিটুলীগোলার জমিদার সাতদিন চোরকুঠ্‌রিতে অনাহারে আটকে রেখে অমানুষিক অত্যাচার করেছিলো। তবু সে মাথা নোওয়ায় নি। শুধু সেই গ্রাম ছেড়ে আসাননগরে চলে এসেছে। তারই অধস্তন পুরুষ মেঘাই সর্দার। সুতরাং সেও মাথা নীচু করবে না নীলকরদের সামনে। সাত সাগরের ওপার থেকে হঠাৎ ভেসে আসা মানুষগুলোকে দেবেনা ওদের বুকের রক্তে ফলানো ফসলভরা মাটি কেড়ে নিতে। হরিশবাবু, মহেশবাবু প্রভৃতি এদের সঙ্গে পরামর্শ

করে বুঝেছে সবাইকে দলবদ্ধ হ'তে হবে। তারপর লড়াই।

কথাগুলো ভাবতেই মেঘাইয়ের রক্তে রক্তে আবেগের জোয়ার খেলে যায়। প্রতিটি রক্তকণিকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। যে করেই হোক্ এ লড়াইয়ে জিততেই হবে।

॥ দশ ॥

কুসুম নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করে। মেঘাই কোলকাতায় চলে গেছে। এতোদূরের পথ। তাই সকালবেলাতে উঠে স্নান সেরে আসান নগরের সর্বমঙ্গলার মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে এসেছে। গলায় আঁচল দিয়ে হাত পেতে নিয়েছে প্রসাদী। কামনা করেছে স্বামীর সবরকম মঙ্গল। মা সর্বমঙ্গলা যেন মেঘাইকে ভালোয় ভালোয় ওর কাছে ফিরিয়ে দেন। তা' হলে আবার পুজো দেবার মানত করেছে।

জমির অনেকটাই কুঠির লোকেরা খড়ির দাগ দিয়ে গেছে তাই ভালো ভালো জমির চাষ একরকম বন্ধ। মেঘাই দাদন নিতে চায় নি। কুঠির দেওয়ানের মুখের ওপরে বলেছে,—না খেয়ে মরবো, তবু দাদন নিয়ে নীলের চাষ করবো না।

কিন্তু ও কোলকাতায় যাওয়ার পরের দিনই লাঠিয়াল সঙ্গে নিয়ে কুঠির দেওয়ান কুসুমকে জোর করে দাদনের টাকা দিয়ে গেছে! ও রাখতে চায় নি। ফেরত-ই বা দেবে কী করে? আর ওরা সময় সুযোগ বুঝেই এসেছে।

নতুন বৌ হয়ে বাড়ীতে আসার পর দিনের বেশীর ভাগ সময়ই কাটতো বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবা করে। আর বাকীটা স্বামীর পরিচর্যায়। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মেঘাইকে জলখাবার খাইয়ে জমিতে পাঠানো, হাতের কাছে জিনিষপত্র গুছিয়ে দেওয়া; তারপর ও জমিতে চলে গেলে রান্নাবান্না সেরে সময় মতো জমিতে দুপুরের খাবার পাঠানো

ইত্যাদি। সংসারের কাজ শেষ হলে নিজে খেয়ে নিয়ে একটু সময় ঘুমিয়ে নিতো। অথবা পাড়া-পড়শী মেয়ে এলে গল্প করতো। সূর্য পশ্চিমে ঢললে আবার সুরু হ'তো কাজ। মেঘাইয়ের হাত মুখ ধোয়ার জল পুকুর থেকে তুলে আনা, উনোনে আগুন দিয়ে রাতের খাবার প্রস্তুত করা ইত্যাদি। সারাটা দিনমান জমিতে পরিশ্রম করে মানুষটা বাড়ীতে ফিরবে, সুতরাং হাতের কাছে সব গুছিয়ে দিতে না পারলে আর কুসুম মেয়ে হয়ে জন্মেছে কেন?

কিন্তু আজ শুয়ে বসেও সময় যেন কাটতে চায় না। আগামীকাল ভীম একাদশী। শিবনিবাসের মাঠে বিরাট মেলা। কামিনী আগেই বলে রেখেছে। কুসুমও যাবে বলেছে। সকালবেলাতেই রান্নাবান্নার পাট চুকিয়ে ওদের সঙ্গে চলে যাবে মেলায়। ফিরতে ফিরতে রাত হলেও ক্ষতি নেই। সকালের রান্নাটা গরম করে নিলেই হবে। মেঘাই তো আর নেই যে এবেলার রান্না ওবেলার দিলে খুঁতখুঁত করবে? ওর কথা মনে পড়তেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। প্রথমে কিছুতেই যেতে দিতে চায় নি কুসুম। অমঙ্গলের আশংকায় বুকটা বারবার কেঁপে উঠেছে। পথঘাট তো ভালো নয়। প্রতিটি বাঁকে বিপদ ওৎ পেতে আছে। তবু শেষ পর্যন্ত ইচ্ছে না থাকলেও ওকে মত দিতে হয়েছে।

মেঘাইও যেন কিরকম হয়ে গেছে। আগের মত সন্ধ্যের পর ওকে ডেকে আর আদর করে না। প্রথম প্রথম অভিমান হ'তো। মেঘাই ঘুমিয়ে পড়ার পর ও শুতে যেতো। তারপর বুঝেছে ঘাড়ের ওপর যে দায়িত্ব এসে পড়েছে, তার জন্যই লোকটা এতো ভাবে। একা একা চুপ করে বসে থাকে। মাঠ থেকে ফিরে এসে দাওয়ায় অর্জুন গাছটার নীচে বসে রাতের অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন চিন্তা করে। কুসুমের প্রথম ডাকে সাড়া দেয় না। পর পর ক'বার ডাকাডাকির পর যেন তন্ময়তা ভেঙে জেগে ওঠে।

মেয়ে হয়ে শরীর খারাপের কারণটা বুঝতে দেরী হয় নি কুসুমের। মনটা আনন্দে নেচে উঠেছে। যার জন্য লালন ফকিরের আখড়ায় গিয়ে সিন্নি দিয়েছে; দেবতা বোধহয় এতোদিনে মুখ তুলে তাকিয়েছেন।

মনে মনে কতোরকম স্বপ্ন দেখেছে। কোলভরা একটা ছেলে ; তাকে নিয়েই কেটে যাবে ওর সারাটা বেলা। দাওয়ায় দুষ্টুমী করে ছোটাছুটি করবে, মেঘাই জমি থেকে ফিরে এলে ছুটে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরবে। রাতে কুসুম বুকের সঙ্গে লেপটে নিয়ে ঘুমোবে।

ঘাট থেকে ফিরে এসে দেখে লক্ষ্মী এসেছে। ওকে দেখে লক্ষ্মী বলে,—কি গো? ছোট বৌঠান জানতে চেয়েছে মেঘাই কি চলে গেছে?

জলভরা কলসীটা কাঁখ থেকে নামাতে নামাতে কুসুম উত্তর দেয়,—হ্যাঁ, গতকালই চলে গেছে। কেন বলতো?

—এমনি। ছোট বৌঠান বললেন খোঁজ নিয়ে যেতে। প্রয়োজন পড়লে আমায় কিন্তু খবর দিও, কেমন?

লক্ষ্মী চলে যায়।

কুসুম জলের কলসী নিয়ে রান্নাঘরে আসে। উনোনে আগুন দেয়। ঘরের কাজগুলো আজ একটু তাড়াতাড়ি সারতে হবে। মেলায় যাওয়া মানেই খরচ। তার ওপর মেঘাই নেই। তবু না করতে পারে নি কামিনীকে। মেয়েটাকে বড়ো ভালো লাগে কুসুমের! আরো বেশী ভালো লাগে এতো অসহায় বলে। বাড়ীর গরুর গাড়ীটা মেঘাই নিয়ে গেছে। তবে গণপতিদের গাড়ী আছে। সকাল বেলাতেই ওদের বাড়ীতে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে। যাক্, তবু এই ফাঁকে মেলা ফেরত ছোট ছোট ভাই-বোনদের সঙ্গে দেখা করে আসা যাবে।

অনেকগুলো গরুর গাড়ী ভিড় করেছে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে। আজকাল একা বড়ো কেউ একটা পথ চলে না। নীলকুঠির আমলাদের জন্য একা মেয়েমানুষদের পথ চলাই দুষ্কর। তার ওপর বয়স্থা হলে তো কথাই নেই। চারিদিকে নীলকরদের বিরুদ্ধে রায়তরা যতো ক্ষেপে উঠেছে, ওরাও ততো বেশী অত্যাচার সুরু করেছে। কোন অবাধ্য রায়তকে ধরে চোরকুঠরীতে আটক করছে অথবা কোন রায়তকে শায়েস্তা করার নামে তার ঘরের সুন্দরী বৌ অথবা বয়স্থা মেয়েকে নীলকুঠিতে নিয়ে গিয়ে রাতের পর রাত

নিজেদের দৈহিক ক্ষুধা মেটাচ্ছে।

কামিনী আর কুসুম গরুর গাড়ী করে চণ্ডীমণ্ডপে আসার পথে দেখে সোহাগী কুঠির দিকে চলেছে। কুসুম মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। শরীরটা ঘৃণায় রি-রি করে ওঠে। ওকে দেখতে ইচ্ছে হয় না। মেয়েমানুষের একি চরিত্র! স্বৈরিণী সোহাগী।

মেঘাইয়ের মুখেই শুনেছিলো কুসুম যে পাঁচু কর্মকারের মেয়ে হলো সোহাগী। আসাননগরের বাজারের পাশে ছিলো ওর দোকান। প্রয়োজনের সময় জিনিষপত্র লোকে সারিয়ে নিলেও পাঁচু কর্মকারকে পয়সা তো আর দিতো না। আর দেবে কোথা থেকে? মাঠের ধান খামারে উঠলে তবে তো ধোপা, নাপিত, কর্মকারের দেনা শোধ হবে। তাই ঘরের অভাব পাঁচুর কিছুতেই মিটতো না! এই অভাবের তাড়না সহ্য করতে না পেরেই পাঁচুর বৌ গলায় দড়ি দিয়েছিলো। সোহাগী তখন ছোট।

আসাননগরে নীলকররা কুঠি গড়তেই পাঁচু আনাগানা সুরু করেছিলো। কার জমি সবচেয়ে ভালো, কোন জমির টুক্রোর কে মালিক এই সব খবরাখবর নাকি পাঁচুই কুঠিতে পৌঁছে দিতো। তারপর একদিন বাজারের পাশের দোকানটা তুলে দিয়ে কুঠিতেই চাকরী নিলো। সঙ্গে সঙ্গে ওর অবস্থাও ফিরে গেলো। আর সেই সঙ্গে মেয়ে সোহাগীও যেন ভোল বদলালো। সেদিনের মাঠে ঘাটে হেলাফেলায় ঘুরে বেড়ানো সোহাগী, শরীরে যৌবনের ঢল নামতেই শাড়ীটা ঘুরিয়ে পরলো। চুলগুলো পেছনের দিকে টেনে বাঁধলো। কপালের মাঝখানে আঁকলো জ্বলজ্বলে কাঁচপোকা টিপ। তারপর শুরু হলো প্রতি সন্ধ্যায় কুঠিতে অভিসার। সাহেবদের থেকে পাওয়া উপহারে সজ্জিতা সোহাগী গাঁয়ের পথ চলতো খুসীতে টইটম্বুর হয়ে।

কুসুম অনেকদিন যখন মাঠের থেকে মেঘাই ফিরে আসার প্রত্যাশায় দাওয়ার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে, দেখেছে সোহাগী সমস্ত শরীরে কামনার ঢেউ তুলে কুঠির দিকে চলেছে, ফিরবে হয়তো বা মাঝরাতে অথবা রাত শেষ হলে।

কামিনীর ডাকে সংবিত ফেরে কুসুমের। গাড়ীটা ইতিমধ্যে

চণ্ডীমণ্ডপের কাছাকাছি এসে গেছে। গাঁয়ের অনেক পুরুষও চলেছে শিবনিবাসে ভীম একাদশীর মেলা দেখতে। সারা বছরে নবদ্বীপ ছাড়া এটাই এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো মেলা। আর অনেকটা নবদ্বীপ দূরের বলে এতোটা পথ যাওয়া সবার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই অনেকেই যায় শিবনিবাসে মেলা দেখতে আর সঙ্গে সঙ্গে ঘর গেরস্থালীর টুকিটাকিও কিনে আনতে। পুরুষকে দিয়ে কি আর মন মতো সংসারের জিনিষ কেনানো যায়? হাতের কাছে যা পায় তাই নিয়ে আসে। দায়সারা গোছের কাজ করে।

ঘোমটাটা আরো নীচুতে টেনে দিয়ে ছইয়ের আড়াল হয়ে বসে কুসুম। একে ঘরের বৌ তায় এতোগুলো গাঁয়ের পুরুষ একসঙ্গে চলেছে। তবু কামিনী সঙ্গে থাকাতে বাঁচোয়া। অনেকেই এগিয়ে এসে মেঘাইয়ের খবর জিজ্ঞাসা করে। কামিনীর মাধ্যমে কুসুম উত্তর দেয়,—কবে ফিরবে তা' তো জানিনে।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে বুকটা স্বামীগর্বে ভরে ওঠে। এতোগুলো মানুষ আজ এই একটা মানুষের মুখ চেয়ে বসে আছে। সমস্ত আসান নগরের আশা ভরসা এই একটা লোকের ওপর নির্ভর করছে। ভাবতেও যেন কেমন লাগে। মেঘাইকে আরো বেশী আবেগ দিয়ে ভালোবাসতে ইচ্ছে যায়। এতোদিন যে মানুষটা শুধু কুসুমেরই একা ছিলো, আজ সেই মানুষটাই যেন সবার মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। সবার দুঃখ নিজের বলে ঘাড়ে তুলে নিয়েছে।

শীতকালের রোদ্দুর। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতার একটা মিঠে আমেজ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দু'ধারে পাকা ফসল ঘরে তুলে নিয়ে যাওয়ায় শূন্য মাঠ। বনতুলসীর ঝোপের ওপর পড়ে রোদটা কাঁপছে। ছইয়ের পেছনদিকের কাপড়ের আড়ালটা তুলে দেয় কুসুম। বেশ ভালো লাগে পরিবেশটাকে। একসঙ্গে সার দিয়ে চলেছে কয়েকটা গরুর গাড়ী। আগে-পিছের গাড়ীগুলোও কেষ্টগঞ্জের দিকে চলেছে মেলাতে বিভিন্ন গ্রাম থেকে দল বেঁধে।

দু'পাশের শূন্য প্রান্তর থেকে হু-হু করে দমকা হাওয়া এসে মাঝে

মাঝে কুসুমের ঘোমটাটা খুলে দিচ্ছে। বুকের কন্দরে একটা কান্না মোচড় দিয়ে ওঠে। মেঘাই থাকলে নিশ্চয়ই সঙ্গে যেতো। আর হাসিঠাট্টায় ভরিয়ে তুলতো প্রহরগুলোকে। মনে আছে বিয়ের বছর দুই চলে যাবার পরও যখন কোলে কেউ এলো না, তখন কুসুম মেঘাইয়ের সঙ্গে গিয়েছিলো কুষ্টিয়ার পাশে কালিগঙ্গার ধারে সেঁউড়িয়া গ্রামে লালন ফকিরের আখড়ায়। অনেকের মুখেই শুনেছিলো যে আখড়ায় মানত করলে নাকি কোল ভরে। মেঘাই কথাটা শুনে হেসেছিলো। তবু কুসুম জোর করাতে কিছু বলে নি। সঙ্গে করেই নিয়ে গিয়েছিলো আখড়াতে। অতোখানি পথ মেঘাইয়ের পাশে বসে যেতে মনেই হয় নি কুষ্টিয়ার লালন ফকিরের আখড়াটা এতোদূরের পথ। আজ মেঘাই সঙ্গে থাকলে নিশ্চয়ই খুনসুটি করতো কুসুমের সঙ্গে।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে গরুর গাড়ী শিবনিবাসের ঘাটে আসে।

কামিনী ঠেলা দেয় ওকে, সই, এতো কি ভাবছিলে গা?

কুসুম আনমনে উত্তর দেয়।

—কই কিছু না তো?

ওর উত্তরে তির্যক দৃষ্টি হেনে ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে এনে কামিনী বলে,—না, আমি বুঝি জানি নে?

—কি বল তো?

—বলবো? রাগ করবি না তো?

—বারে, রাগ করবো কেন?

—কোলকাতায় যে গেছে তার কথা।

—যাঃ, তুই ভারী অসভ্য।

কামিনীর পেছন পেছন কুসুম গাড়ী থেকে নামে। ঘাটের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে যায় প্রথম যেদিন আলো-সন্ধ্যার মিলন মুহূর্তে মেঘাইকে দেখেছিলো। মনটা বিষণ্ন হয়ে ওঠে। মানুষটা এখন কতোদূরে।

মেলাতে ঘুরে ঘুরে কুসুম গেরস্থালীর জন্য বেলুন-চাকী, কড়াই ইত্যাদি কেনে। তারপর খুঁজে বার করে মেঘাইয়ের জন্য কামিজের

কাপড়। নিজে হাতে কিনে না দিলে তো মানুষটা কিনবে না। কোলকাতা যাবার আগের হাটবারে বারেবারে কুসুম একটা কামিজের কাপড় আনতে বলেছিলো। আর মেঘাই নিয়ে এসেছিলো ওর জন্য একটা শাড়ী। সংসারের জিনিষ, মেঘাই আর ছোট ছোট ভাইবোনদের জামার জন্য কাপড় ইত্যাদি কিনে কুসুম মেলা থেকে বেরিয়ে আসে। বাড়ীতে গেলেই তো ভাইবোনগুলো ঘিরে ধরবে। সারা বছর কিছুই পায় না। তাই প্রতিবার মেলা থেকে ভাইবোনদের জন্য হাতে কিছু না নিয়ে বাড়ীতে ঢোকে না কুসুম।

সামনেই বাউলতলা। ছোটবেলাতে বাবার সঙ্গে মেলা দেখতে এসে কুসুম বাউলতলাতেই সমস্ত সময়টা কাটিয়ে দিতো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতো ওদের নাচের বিভিন্ন রকম অঙ্গভঙ্গি। গানের কলিগুলো সব সময় বুঝতো না, তবু ভালো লাগতো। আজও লাগে।

ইচ্ছে ছিলো বাউলতলায় কিছুক্ষণ কাটাতে। কিন্তু উপায় নেই। অন্য সবাইয়ের মেলা দেখার ফাঁকে ওকে বাড়ী থেকে ঘুরে আসতে হবে।

বাড়ীতে ঢুকে দেখে ভাইবোনগুলো ওরই প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছে। প্রতিবছরই কিছু না কিছু প্রত্যেকেই পায়। সেই লোভেই ওরা পথ চেয়ে থাকে। কামিনীকে বসতে দিয়ে কুসুম ভেতর ঘরে আসে।

বাবা বাড়ী নেই। হয়তো বা কারো কোন ঠিকা কাজ পেয়েছে, সেই কাজেই ব্যস্ত। পরের বোন মালতী ইতিমধ্যে বেশ ডাগর হয়ে উঠেছে। কুসুমের কষ্ট হয় ওকে দেখে। শাড়ীর অভাবে ঘরের বাইরে যেতে পারে না। প্রথম যৌবনের ছোঁয়া লাগা অবয়বটার আব্রু রাখতে ঘরের কোণেই পড়ে থাকতে হয়। কুসুমেরও এমনি একদিন ছিলো। আজ না হয় সেদিনগুলো পেরিয়ে এসেছে। ও ঘরে ঢুকতেই মালতী ওকে জড়িয়ে ধরে,—দিদি এসেছিস! ওর হাতে চুলের কাঁটা, কয়েক-গাছা কাঁচের চুড়ি আর কয়েকটা কাঁচপোকা টিপ দিতে দিতে কুসুম বলে,—আসবো না কেন রে? তোরা তো আর যাবিনে। আর যাবি কেন? পরের ঘরে গেছি বলে আমিও তো তোদের কাছে পর হয়ে

গেছি, তাই না ?

ওকে ছেড়ে দিয়ে মালতী একটু সরে দাঁড়ায়। কুসুম বুঝতে পারে ওর মনের ব্যথাটা। যে মেয়ে পরনের শাড়ীর অভাবে ঘরের বাইরের দাওয়ায় এসে দাঁড়াতে পারে না, সে কি করে যাবে আসাননগর ?

ওকে কাছে ডেকে আদর করে চিবুকটা নেড়ে দিয়ে কুসুম বলে,—বাবারে, এইটুকুতেই বুঝি অভিমান হলো ? তবে তো দেখছি সত্যি এবারে একটা ছেলের খোঁজ করতে হয়। ওর কথায় মলতী লজ্জা পেয়ে রান্নাঘরে সরে গিয়ে আত্মগোপন করে।

কুসুম মনে মনে ঠিক করে বাড়ী গিয়ে মেঘাইয়ের আনা শাড়ীটা মালতীকে পাঠিয়ে দেবে। অতো রঙীন শাড়ী বিয়ের এতো বছর পরে কি পরা যায় ! নাই-বা এসেছে কোলে কেউ। তবু নিজেরও লজ্জা সরম বলে একটা জিনিষ আছে। কিন্তু মেঘাইকে বললেই রেগে উঠে। এক এক সময় হাসিও পায়। মেঘাই যেন ওকে রঙীন শাড়ী, কাজল আর আলতায় সেই নতুন বৌ-য়ের সাজে সব সময় সাজিয়ে রাখতে চায়। মা না হলেও বুঝি ওর বয়েস বাড়ে নি !

মালতী চা করে আনে। চায়ের বাটিটা ওর হাত থেকে নিয়ে কুসুম জিজ্ঞাসা করে,—বাবা কোথায় রে মালতী ?

—বাবা তো সেই সকালে কাজে গেছে, কখন আসবে জানি না।

মালতী চুপ করে। কুসুম বুঝতে পারে শতছিদ্র এ সংসারের সমস্ত চাপই এসে পড়েছে মেয়েটার ওপর। ওর সময়ে তবু মা ছিলো। কিন্তু মালতী তো একলা।

—দিদি, জামাইবাবুকে নিয়ে এলি না কেন ?

—তোর জামাইবাবু তো কোলকাতায় গেছে। পরে একদিন একসঙ্গে আসবো, কেমন ? আর সেই সময় তোর জন্য শাড়ীও আনবো।

কুসুমের লক্ষ্য এড়ায় না যে শাড়ীর কথা শুনে মালতীর চোখ দু'টো চক্‌চক করে উঠেছে। এমন একটা সংসারে এসেছে মেয়েটা যেখানে সখ-আহ্লাদ মেটা তো দূরের কথা, সম্ভাবনাও নেই।

সংসারের একথা সেকথা জিজ্ঞাসা করার পর কুসুম উঠে পড়ে।

ভাইবোনগুলোকে আদর করে। গ্রামের ওর বয়েসী মেয়েদের কথা জিজ্ঞাসা করে। তারপর কামিনীকে সঙ্গে নিয়ে শিবনিবাসের ঘাটে আসে।

ঘাটে এসে দেখে ওর জন্য সবাই অপেক্ষা করছে। এর পরে গেলে পথের মাঝেই বেলা পড়ে যাবে। শীতের বেলা এমনিতেই ছোট। সন্ধ্যের আগে পথ পার হ'তে না পারলে বিপদও কম নয়।

কুসুম গাড়ীতে ওঠে। পেছনের দিকের পর্দাটা ফেলে দেয়।

দলবেঁধে মেলা থেকে সবাই ফিরে চলেছে। কেউ চলেছে কেষ্টনগর, মেহেরপুর, চড়ুইটিপি অথবা অন্য কোন গ্রামে।

গাড়ীতে বসে ঝিমুনি লাগে কুসুমের। সূর্যটা অনেক নীচে নেমে গেছে। মাঠের ওপরের কুয়াশাগুলো স্থির হয়ে একজায়গাতেই পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

মাথার ভেতরে একটা যন্ত্রণা অনুভব করে কুসুম। সারা শরীরে হঠাৎ অবসাদ নামে।

॥ এগারো ॥

বাড়ীতে ফিরে গাড়ী থেকে নেমে সোজা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে কুসুম। খেতে আর ইচ্ছে করে না। কামিনীকে ডেকে খেয়ে নিতে বলে। টেমিটা নিভিয়ে দেয়। অন্ধকার ঘর।

মনের ভেতরে একটা আশা, এতোদিনের আকাংখা যেন দোল দিয়ে যায়। কামিনী গাড়ীতেই বলেছিলো। কিন্তু কুসুম সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি। কি করেই বা করবে? এতোদিনের স্বপ্ন, যার জন্য এতো সাধ্য-সাধনা, তা' কি শেষে রূপ নেবে? কিন্তু যদি সত্যি হয়? পরমুহূর্তেই মনে হয়, হয়তো বা এটা নিছকই স্বপ্ন। সব স্বপ্নের মুকুলই কি আর বাস্তবের রঙীন ফুল হয়ে ওঠে? সব নদীই তো সাগরের দিকে লক্ষ্য রেখে পথ চলা সুরু করে; কিন্তু সাগর-

পুরুষের আলিঙ্গনে ধরা দিতে পারে ক'টা ? অধিকাংশই পথ হারায় মাঝ পথে। তবু কুসুমের আশা-পাখী ডানা মেলে কল্পনার রঙীন আকাশে।

এ স্বপ্ন সত্যি হলে ওর চেয়েও বেশী খুসী হবে মেঘাই। নিশ্চয়ই ওকে জড়িয়ে ধরবে। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেবে। আর কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না কথাটা। তারপর ?

তারপরের বাকীটুকু আর ভাবে না কুসুম। এতো সুখও কি ওর কপালে আছে ? মাতৃত্বের স্বাদ না পেলে মেয়ে হয়ে জন্মানোই যে বৃথা। ছোটবেলায় মা-বাবার স্নেহের ছায়ায় বেড়ে ওঠা কুমারী-কন্যা স্বামীর চোখের আয়নায় খুঁজে পায় নিজেকে। আর সন্তানের মাঝে উভয়ে আবিষ্কার করে উভয়কে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে কুসুম। ছোট্ট দু'টো হাত, একরাশ চুল, টলমলে পা দু'টোয় কোনরকমে ভর দিয়ে ওর দিকে ছুটে আসছে। এক সময় ওর কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে দেখে সকাল হয়ে গেছে। জানলা দিয়ে রোদের ফালি এসে লুটিয়ে পড়েছে মেজেতে। কামিনী একপাশে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। কখন যে খাওয়া দাওয়া সেরে ওর পাশে এসে শুয়েছে টেরই পায়নি। মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। ছোটবেলার থেকেই শুনে এসেছে, ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়। আর আজকের এই সোনালী সকাল, মেজেতে পড়া নরম রোদের টুকরো ওর মনে প্রাণে যেন সেই স্বপ্ন-সফলের রেশ ছড়িয়ে দেয়। কামিনীকে ডাকে।

কয়েকবার এপাশ ওপাশ করে কামিনী চোখ খুলে তাকায়। তারপর ওকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করে,—কি ব্যাপার সই, ঘুম থেকে উঠে এভাবে বসে আছিস যে ?

কুসুম একবার ভাবে কামিনীকে বলে। কিন্তু ভোরের স্বপ্ন নাকি কাউকে বলতে নেই। তাই কামিনীর জিজ্ঞাসায় বলে, এমনি। উঠতে উঠতে দেরী হয়ে গেল, তাই।

কথা ক'টা কোনরকমে ছুঁড়ে দিয়ে কুসুম বিছানা ছেড়ে ওঠে। গৃহদেবতাকে গড় হয়ে প্রণাম করে।

চা খেয়ে কামিনী বাড়ীতে যায়। মেঘাই না এলে সন্ধ্যের পর আবার আসবে। ভাইদের সংসার। সুতরাং ইচ্ছে থাকলেও সারা-দিন ওর কাছে থাকার উপায় নেই। তা'হলে এদিকের সংসারের কাজগুলো করবে কে? এতো করেও তবু কারো মন পায় না। মুখ ঝাম্‌টা ছাড়া কেউ ওর সঙ্গে কথা বলে না। পেট পুরে দু'বেলা দুমুঠো খেতে পায় কিনা সন্দেহ। কুসুমের কষ্ট লাগে। নিজের সংসার গড়তে গিয়েও পারে নি। সে কি ওর দোষ? কিন্তু এ সংসারে এই সহজ কথাটাই বোঝানো বোধহয় সবচেয়ে কঠিন। সেই ছোটবেলা থেকে প্রতি মেয়েই তো এই একটা স্বপ্ন দেখে থাকে। বড়ো হবে, স্বামী-পুত্র ঘিরে গড়বে ছোট্ট একটা সংসার। অভাব থাক্, তবু যেন ভালো-বাসা থাকে। থাকে একটা সংসারের স্নিগ্ধ ছায়া। একটা পুরুষের বুকের উত্তাপে ভবিষ্যতের নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা।

কামিনীই-একদিন কথায় কথায় বলেছিলো,—সই, নিজের পুরুষকে আঁচলে বাঁধতে পারিনি, তা' আমি কি করবো? সে যখন যা চেয়েছে, তাই তো দিয়েছি। বাসর লগ্নেই সঁপেছি মন, প্রথম রাতেই দিয়েছি দেহ। তবু ক্ষুধা মেটাতে পারলাম না। আর যে পুরুষ মনের মানুষ হলো না, মনের কাছাকাছি এসেও দাঁড়ালো না, কেন তার জন্য সারাটা জীবন ধরে এ লাঞ্ছনা, গঞ্জনা আমায় সহ্য করে যেতে হবে?

ওর কথাগুলো কুসুমের হৃদয়ের গভীরে গিয়ে বিঁধেছিলো। অনেক দিন পর্যন্ত কথাগুলো ওর অন্তরকে নাড়া দিয়েছিলো। পুরুষ যদি প্রেমিক না হয়, তবে সে পুরুষকে ধরে রাখা, কামিনী কেন, পৃথিবীর কোন মেয়ের পক্ষেই সম্ভব নয়।

রাতশেষের স্বপ্নের রেশটা সারাদিন কোন কাজে মন বসতে দেয় না। অদ্ভুত এক অনুভূতি মনের প্রতিটি কোষে কোষে আবেশের বিহ্বলতা আনে। কোনরকমে পুকুরঘাট থেকে স্নান সেরে এসে দুপুরের রান্নাটা সেরে ফেলে। রান্না করলেও খেতে ইচ্ছে করে না। গতকাল থেকেই খাওয়ার স্পৃহাটা যেন চলে গেছে। তবু একেবারে না খেয়ে পারে না। মেঘাই বাড়ীতে নেই, যদি আবার এ সময়ে শরীরটা আরো বেশী খারাপ হয়ে পড়ে।

খাওয়া দাওয়া সেরে এলোচুলে একটা গিঁট দিয়ে দাওয়ার অর্জুন গাছটার তলায় এসে বসে কুসুম। একলা নিরালা দুপুরে এলোচুলে গাছের নীচে বসতে নেই। তার ওপর পেটে যখন কেউ এসেছে বলে মনে হচ্ছে।

দাওয়া থেকে উঠে ঘরের কুলঙ্গী থেকে আধবোনা বেনিয়ান হাতে নিয়ে ফিরে আসে। হাতে যখন কোন কাজ নেই, তখন কিছুটা সময় তো অন্তত কাটবে। বুনতে গিয়ে হাসি পায়। বিয়ের পর মেঘাই চলে গেলে হাতে যখন কোন কাজ থাকতো না, কুসুম বসে বসে ছোটদের জামাকাপড় সেলাই ফোঁড়াই করতো। আর এই নিয়ে মেঘাই ওর সঙ্গে খুনসুটি কম করে নি। তারপর অবশ্য নিরাশ হয়ে কুসুমই আর বুনতো না। এতোদিন পরে আজ আবার ইচ্ছে হয়।

বেনিয়ান বুনতে বুনতে মাঝে মাঝে দৃষ্টিটা ভেসে যায় সুদূরে। উদাসী দুপুর ; অনেকগুলো শঙ্খচিল গাছগুলোর মাথা ঘিরে এক নাগাড়ে উড়ে চলেছে। দুই একজন পথচারী অলস পায়ে হেঁটে চলেছে। রোদ-রশ্মিগুলো প্রলম্ব হয়ে মাঠের ওপর শুয়ে রয়েছে। কয়েক জোড়া শালিক চঞ্চল পায়ে এদিকে ওদিকে কি যেন খুঁটে বেড়াচ্ছে।

দূর থেকে গরুর গাড়ীটা নজরে পড়তেই কুসুম বোনা রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। উৎসুক তারা দু'টোয় কাঁপন লাগে। প্রতীক্ষিত বুকটা আশায় কেঁপে ওঠে। অস্পষ্ট গাড়ীটা এগিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে। হ্যাঁ, মেঘাই আসছে। আনন্দে কুসুম তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে ঢোকে। শাড়ীটা বদলায়। তারপর দাওয়ার কাছে এসে দাঁড়ায়।

মেঘাই গাড়ী থেকে নামে। জিনিষপত্রগুলো নামায়। তারপর কুসুমকে জিজ্ঞেস করে,—কেমন আছো ?

—ভালো।

চেষ্টা করেও খবরটা চেপে রাখতে পারে না কুসুম।

—শোন !

—কি ?

—কাছে এগিয়ে না এলে বলবো না। কুসুম ঘন হয়।

মেঘাই এগিয়ে এসে ওর গা ঘেঁসে দাঁড়ায়। কুসুম লজ্জায় রক্তিম হয়ে ওঠে। তারপর মেঘাইয়ের কানে কানে কথাটা বলে। কুসুমের কথাটা বিশ্বাস করতে মন চায় না। ওকে জড়িয়ে ধরে মেঘাই বলে,—সত্যি বলছো কুসুম ?

—কামিনী তো লক্ষণগুলো দেখে তাই বলছে।

মেঘাইকে উচ্ছ্বসিত হ'তে দেখে কুসুম বলে,—এখনো তো দেরী আছে। রাস্তায় নিশ্চয়ই ঘুম হয়নি। শরীরটার যা হাল করেছো।

তেলের বাটি, গামছা এগিয়ে দিয়ে কুসুম বলে,—যাও, নেয়ে এসো। আমি এই ফাঁকে ভাত চড়িয়ে দি।

মেঘাই জিনিষপত্র খোলে। কুসুমের জন্য আনা কালীঘাটের পট, রেশমী চুড়ি, প্রসাদ বার করে ওর হাতে দেয়। হিন্দু পেট্রিয়টের সংখ্যাগুলো তুলে রাখে। ফাদারকে দেবার জন্য হরিশবাবু দিয়েছে।

জিনিষগুলো পেয়ে কুসুম খুসীতে টই-টম্বুর। কতোদিনের সাধ কালিঘাটের একটা পট। পটটা নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে ঠাকুরঘরে টাঙায়। প্রসাদ দেয় মেঘাইকে, বাকীটা তুলে রাখে। রেশমী চুড়ির কয়েকজোড়া শাড়ীর সঙ্গে মালতীকে পাঠিয়ে দেবে।

মেঘাই পুকুরঘাটে গেলে কুসুম রান্নাঘরে আসে। মনটা খুসীর জোয়ারে পাল তোলে। সাত মাস দেখতে দেখতে চলে যাবে! মেঘাইয়ের মুখ দেখে বুঝতে পারে কুসুম যে খবরটাতে ও খুবই খুসী হয়েছে। পিতা হবার প্রচণ্ড আনন্দে মানুষটা যেন সবকিছু ভুলে বসে আছে। আর কেন-ই বা হবে না ? বিয়ের পর কতো রাত এই নিয়ে দু'জনের অভিমান। এ ওর ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছে। আর আজ ? এতোদিন পরে ওদের সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিতে চলেছে। মনে মনে হাত জোড় করে প্রণাম করে কালিঘাটের পটের উদ্দেশে।

পুকুরঘাট থেকে নেয়ে এলে কুসুম ওকে খেতে দেয়। তারপর শিবনিবাসের ভীম একাদশীর কথা বলে। লক্ষ্মী ওর খোঁজ করে গেছে। ফাদার কোলকাতা থেকে ফিরে এলে দেখা করতে বলেছে,

ইত্যাদি খবরাখবর দেয়।

মেঘাই যেন একটু অন্যমনস্ক। ভাতগুলো সামনে নিয়ে শুধু নাড়াচাড়াই করছে। বড়ো একটা মুখে তুলছে না।

—তুমি তখন থেকে কি এতো ভাবছো বলোত?

ওর জিজ্ঞাসায় মেঘাই দৃষ্টি তুলে তাকায়। তারপর বলে,—জানো কুসুম, অবস্থা খুব একটা ভালো মনে হচ্ছে না। আসতে আসতে শুনলাম তিতু মীরের সঙ্গে নাকি স্থানীয় নীলকরদের বেশ বড়ো রকমের দাঙ্গা হয়ে গেছে। বেতাইয়ের ইস্থব বিশ্বাস এবং বৃন্দাবন দত্ত নাকি শ'খনেক লোক নিয়ে কুঠি আক্রমণ করেছিলো। এদিকে চৌগাছার বিষ্ণুচরণ আর দিগম্বর কাঠগড়া কুঠির দেওয়ানির কাজ ছেড়ে দিয়েছে।

—তা' তুমি এতো চিন্তা করছো কেন? সবার ভাগ্যে যা আছে, আমাদেরও না হয় তা-ই হবে।

ওর কথা শুনে হেসে ওঠে মেঘাই।

—বাঃ, এতো বড়ো একটা কঠিন সমস্যার তো বেশ সহজ সমাধান করে দিলে!

খাওয়া সেরে হাত মুছতে মুছতে বলে,—আমি ছোট বৌঠানের কাছ থেকে ঘুরে আসছি। ফিরতে যদি রাত হয় তবে যেন চিন্তা করো না।

০ ০ ০

খিড়কি দিয়ে ভেতরে ঢুকে ছোট বৌঠানের ঘরের সামনে আসে মঘাই। লক্ষ্মী এসে দরজা খুলে দেয়। ছোট বৌঠান কোণের দিকে বসে রয়েছে। মেঘাইকে দেখে উঠে এসে বলে, এসো মেঘাই, কবে এলে?

—আজ দুপুরেই এসেছি।

ওকে বসতে দিয়ে লক্ষ্মীর দিকে ফিরে ছোট বৌঠান বলে,—লক্ষ্মী বাইরে যা।

লক্ষ্মী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বৌঠান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করে কোলকাতার খবর, চারদিককার বর্তমান পরিস্থিতি। মেঘাই বলে যে হরিশবাবু ওদের গোপনে সংগঠন করতে বলেছে। গোলমাল সুরু হলে নীলকররা আর কতোক্ষণ যুঝবে!

—শুধু নীলকরদের ধ্বংস করেই বুঝি শান্ত হয়ে যাবে? আর যারা নিজেদের বিলাসিতার জন্য তোমাদের ভবিষ্যত ওদের কাছে বন্ধক দিয়েছে, তাদের?

মেঘাই তাকিয়ে দেখে ছোট বৌঠানের শান্ত চোখের তারা দু'টো যেন এই মুহূর্তে ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে।

কথা ক'টা শেষ করে ছোট বৌঠান অশান্ত পায়ে ঘরের ভেতর কয়েকবার পায়চারি করে। তারপর আলমারীটার দিকে এগিয়ে যায়। মেঘাই বুঝতে পারে পরের ঘটনা। জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে,—বৌঠান, আমি তা'হলে এখন চলি। যা হয় পরে আপনাকে খবর দিয়ে যাবো।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে মনটা বৌঠানের জন্য বিষণ্ণ হয়ে উঠলেও কোথায় যেন একটা আনন্দের রেশ জাগে। সর্বংসহা স্তব্ধ মাটিতে এবার কাঁপন লেগেছে। বিরাট বড়ো প্রাচীন একটা প্রাসাদের দেওয়ালে যেন জন্ম নিচ্ছে বিশাল এক মহীরূহ। একদিন আকাশের ঝড় নামবে সেই বনস্পতির পাতায় পাতায়। সুরু হবে মাতন। ধ্বসে পড়বে মাঠের মাঝে দাঁড়ানো বিরাট বড়ো কুঠি, পলদা বিলের জলে প্রত্যহ প্রভাত-সূর্যের আলোয় মুখ দেখা জমিদার বাড়ী, জলসাঘর সব।

বাড়ীতে ফিরে দেখে কুসুম বিকেলের রান্নাবান্না সেরে ওর জন্য অপেক্ষা করছে। আজ ওকে খুব সুন্দরী দেখাচ্ছে। বিকেলে গা ধুয়ে একটা রঙীন শাড়ী পরেছে। অন্যান্য দিনের চেয়ে বড়ো করে দিয়েছে সিঁদুরের টিপ। মাতৃত্বের গর্ব্বে ও যেন আজ গর্বিতা। মেঘাই এলে ওকে খেতে দেয়।

শুয়ে শুয়ে কুসুম বলে,—কই, কোলকাতা কেমন দেখলে বললে না তো?

মেঘাই একে একে বলে হরিশ মুখার্জির কথা, কোলকাতার লাট ভবন, মারাঠা ডিচ্, কালিঘাটে পূজো দেওয়ার ইতিবৃত্ত, পথের বর্ণনা, নৈহাটির গঙ্গা।

কুসুম অবাক হয়ে শোনে। কখনো বা ভয়ে শিউরে ওঠে।

এক একবার মেঘাইয়ের নিজেরই আশ্চর্য লাগে। এমনি করেই চলেছে আজ এতোগুলো বছর। পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে পেয়েছে সাহস, আত্মবিশ্বাস আর ভালোবাসা। ইচ্ছে ছিলো এমনি করেই দু'জনে ভেসে চলবে আগামী জীবনে। জীবন-নাট্যের এই বিরাট খেলাঘরে হাসি-কান্না সুখ-দুঃখ, মান অভিমান সবকিছুই সমান ভাগে ভাগ করে নেবে। কিন্তু আজ বাইরের হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এসে যেন মেঘাইকে সেই জীবনের পথ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। ভাসিয়ে দিয়েছে অন্য এক স্রোতে।

তাকিয়ে দেখে কুসুম ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। মেঘাই ওর বুকের ওপর থেকে খসে পড়া আঁচলটা ঠিক করে দেয়। গভীর স্নেহে কাছে টানে ওকে। হ্যাঁ, যতো বড়ো ঝড়-ই আসুক, মেঘাই যে স্রোতেই চলুক, তবু কুসুমের ঘর যাতে কোন ঝড়েই না ভাঙে, ওর স্বপ্ন যাতে কোন কিছুতেই না মোছে—তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে মেঘাই।

॥ বারো ॥

ফাদার বমভাইটিস্ ঘরেব মধ্যে পায়চারী করে বাইবেল পড়ছিলো। মেঘাই ঘরে ঢুকতে হাতের খোলা বাইবেলটা টেবিলের ওপর রেখে ওকে সামনের চেয়ারে বসতে বলে। মেঘাই চেয়ারে বসে ঘরটাকে দেখতে থাকে। পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম ঘরটা ওঁর মার্জিত রুচি এবং পবিত্র মনের পরিচয় বহন করেছে। ঘরের একদিকে দক্ষিণ জার্মানীর ছোট্ট একটা গ্রামের বিরাট বড়ো ল্যাণ্ডস্কেপ। দেশ ছেড়ে হাজার হাজার

মাইল দূরে এসেও ফাদার ভুলতে পারেন নি তাঁর সাধের গ্রামটাকে। বাঁ পাশের দেওয়ালে মাদাম মেরীর ছবি। ঠিক নীচে যীশুখৃষ্টের ক্রুশ। এক ধারের আলমারী বিভিন্ন ভাষার বইয়ে ভর্তি।

ওর মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ফাদার ওকে জিজ্ঞাসা করে,—কি খবর মেঘাই? কোলকাতা কেমন লাগলো? একটু চুপ করে থেকে মেঘাই বলে,—খুব ভালো লাগে নি।

—কেন?

—কারণ, একটা শহরের শিক্ষিত সমাজের কাছ থেকে যা আশা করেছিলাম, কোলকাতায় তার কিছুই পেলাম না। বরং উল্টোটাই মনে হলো। সেখানকার অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, ওদের সমর্থন করে। তাদের ধারণা এর মাধ্যমেই আমরা নাকি 'সভ্য' হবো। তাই ওদের কাছে কিছু আশা করাটা আমার মনে হয় নেহাৎই দুরাশা। চাষীদেরই এ বিষয়ে এক-জোট হ'তে হবে। যদি করম আলি চৌধুরীর মতো জমিদার আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায় ভালো, নইলে নিজেরাই যুঝবো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ফাদার বমভাইটিস্ বলে।

—তোমার কি মনে হয় জমিদাররা তোমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে?

—না, দু'একজন হলেও সবাই নয়। রায়তদের থেকে নীলকরদের জমি দেওয়ার ঝামেলা অনেক কম! তা'তে সেই সময়টা রায়তদের পেছনে খরচ না করে নিশ্চিন্ত বিলাসিতায় কাটানো যায়। আর সব জমিদারের ক্ষমতাও নেই এদের বিরোধিতা করার। যেমন দিগম্বরের জমিদার কৈলাসচন্দ্র রায় কিছুতেই রায়তদের হাত থেকে জমি ছিনিয়ে নিয়ে নীলকরদের হাতে দিতে চান নি। কিন্তু ওদের বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা ছিলো না বলে কৃষ্ণনগরে পালিয়ে এসেছিলেন। শেষ পর্যন্ত নীলকরদেরর জমি দেবেন এই প্রতিশ্রুতিতে আবার ফিরে এলে ওরা তার বাড়ী ঘর পুড়িয়ে ফেলে বন্দী করে। পরে তাঁর আত্মীয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় নীলকরদের কাছে টাকা দিয়ে তাঁর মুক্তি কিনে তাঁকে কৃষ্ণনগরে নিয়ে যান।

কথাগুলো শুনে ফাদার যেন আত্মস্থ হন। মেঘাই হরিশবাবুর

পাঠিয়ে দেওয়া 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সংখ্যাগুলো দেয়। পত্রিকাগুলোর ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে ফাদার বলে,—মেঘাই, তোমাদের দেশটাকে যতো দেখছি, ততো অবাক হচ্ছি। তারচেয়েও বেশী অচেনা বলে মনে হচ্ছে। সেই কোন্ ছেলেবেলায় নিজের দেশ ছেড়ে যার জন্য এই বিশাল পৃথিবীর পথে বেরিয়ে পড়েছিলাম, আজ মনে হয় তা' যেন আমার পথে পায়ে পায়ে জড়িয়ে রয়েছে। কিছুতেই তার থেকে আমার মুক্তি নেই।

ফাদার চুপ করে। কি যেন ভাবে। তারপর জায়গা থেকে উঠে গিয়ে নিজের গ্রামের ছবিটার সামনে দাঁড়ায়। বলে, মেঘাই জানো, আমাদের গ্রামটা ছিলো দক্ষিণ জার্মানীর একেবারে প্রান্ত ঘেঁষে। সুইস্-আলপ্‌সের গায়ে। ব্যাভেরিয়ায়।

ছোট্ট গ্রাম ফ্রিডেন্ ডর্ফ। আক্ষরিক অনুবাদ করলে যার অর্থ: শান্তির পল্লী। সত্যি বলতে কি, শুধু নামেই নয়, চরিত্রেও ওখানে সদা সর্বদা শান্তি বিরাজ করতো। পাহাড়ের কোলে। হাজার কয়েক পরিবারের বাস। আমাদের বাড়ীর জানলায় দাঁড়ালে নজরে পড়তো সার সার পাহাড়ের চূড়া ঢেউ খেলে এগিয়ে গেছে সুইজারল্যাণ্ডের দিকে। তুষারধবল সেই চূড়াগুলো ছোটবেলা থেকেই আমায় হাত-ছানি দিতো। মনে হ'তো পাহাড়গুলো পেরিয়ে চলে যাই। হ্যাঁ, অনেক দূরে। সেই বয়েসেই সময় পেলে এসে দাঁড়াতাম জানলার পাশে। দৃষ্টিটা ভেসে যেতো দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়গুলোর চূড়োয়; চূড়া ছাড়িয়ে ভাসমান মেঘের ভেলায় ভেসে বেড়াতো আমার মন।

আমার বাবার ছিলো 'বিয়ার হাউস'। সারাদিন মাতালদের সঙ্গে মাতাল নিয়েই কারবার। দোকানের ঝাঁপ ফেলে রাত্রে বাড়ীতে এসে কাজের মধ্যে কাজ ছিলো বাড়ীর শান্তি নষ্ট করা। কারণে অকারণে মা'র ওপর অত্যাচার করলেও মা কিন্তু মুখ বুজে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে সবকিছু সহ্য করতেন।

মাঝে মাঝে কাইজারের লোকজন এসে বিনা কারণে ধরে নিয়ে যেতো বাবাকে। জোর করে টাকা আদায় করতো। টাকা দিতে পারলে

ভালো, নইলে অকথ্য অত্যাচার। আর বাড়ী ফিরে এসে সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতো মা'র ওপর।

আমি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ব্যাভেরিয়ার প্রধান শহর মিউনিকে গিয়েছিলাম, অক্টোবর উৎসব দেখতে। এখানকার শিবনিবাসের মতোই মিউনিকে অক্টোবরের সুরুতেই সুরু হয় উৎসবটা। চলে দিন ষোল ধরে। দিন কয়েক সেই উৎসব কাটিয়ে ভরা মন নিয়ে বাড়ীতে ফিরে-ছিলাম। কিন্তু—

এই পযন্ত বলে ফাদার থামে। চোখের দৃষ্টিতে বিষণ্ণতা নামে। ছবিটাকে ভালো করে দেখে। সম্ভবত সেই পিছে ফেলে আসা দিন-গুলোর কথাই ভাবে। তারপর ফিরে এসে আবার জায়গাতে বসে:

—আমি যাবার আগেই কাইজারের লোকজন এসে বাবা মা'কে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। সময় মতো খাজনা না দিতে পারার দরুন। বাবাকে ছেড়ে দিলেও ওরা আটকে রেখেছিলো মা'কে। কেন? তা' তো নিজেই বুঝতে পারো।

মা ক'দিন পরে ছাড়া পেয়ে ফিরে আসতেই বাবা সুরু করলো অত্যাচার। যেন মা'র ইচ্ছেতেই এটা হয়েছে। যে মা নীরবে এতো-দিন সব অত্যাচার সহ্য করে এসেছেন, এবার আর পারলেন না। সহ্যের তো একটা সীমা আছে। রাত্রিবেলা আত্মহত্যা করলেন আর বাবা হলেন দেশান্তরী।

আমি অক্টোবর উৎসব থেকে ফিরে এসে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সব শুনলাম। ছোটবেলা থেকেই মাইথলজি আমায় টানতো। ছাত্রও ছিলাম আমি মাইথলজির। চেষ্টা করেছিলাম বাড়ীতে থাকতে। কিন্তু মন বসাতে পারি নি। সুইজারল্যাণ্ড সীমান্তের কাছে একটা ক্যাথলিক মিশন ছিলো। একদিন নিজের গ্রাম ছেড়ে চলে এলাম সেই শহরে; নাম লেখালাম সেই মিশনে। দেশে আমার কেউ নেই। সুতরাং কিসের আকর্ষণে আর ওখানের মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকবো? তাই জার্মান সুইজারল্যাণ্ডের সীমানা ছেড়ে পাড়ি দিলাম মধ্যপ্রাচ্যে। তিউনিসিয়া, ইজিপ্ট ঘুরে এসে একদিন নামলাম সোনালী রোদ ঝলমলে মাদ্রাজ উপকূলে।

ভালো লেগে গেল দেশটাকে। তার চেয়েও বেশী লাগলো এদেশের অসহায় মানুষগুলোকে। সাধারণ মানুষ আমি; জন-সাধারণের ভীড়েই মিলেমিশে থাকতে চাই। ভালোও বাসি। আর তাই তো নীলকররা আমার মহাদেশের মানুষ হলেও আমার আত্মিক যোগ তাদের সঙ্গে নয়।

ফাদার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে গিয়ে যীশুখৃষ্টের ক্রুশের নীচ থেকে ছোট্ট বাইবেলটা হাতে নেয়। কি যেন একটু ভাবে। তারপর মেঘাইয়ের দিকে ফিরে বলে,—জানো, ছেলেবেলায় যখন কিছু বুঝতাম না, ভাববার ক্ষমতাও ছিলো সীমাবদ্ধ, একটা ঘেরাটোপের ভেতর বন্দী, তখন সব কিছুতেই কাউকে না কাউকে দোষী করেছি, অভিযোগ জানিয়েছি। অভিমানে নিজের হৃদয়কে নিজেই কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিও বেড়েছে। বুঝতে শিখেছি কোন মানুষ দুঃখের ভেতর দিয়ে পথ না হাঁটলে তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারে না। কারণ দুঃখের পথই হলো সত্যের পথ। সুখ? সে তো বেলাশেষের রঙিন মেঘের হঠাৎ রোদ্দুর। এক মুঠো সময় যার আয়ু।

কথাগুলো শেষ করে ফাদার একটু চুপ করে। তারপরে ছেঁড়া প্রসঙ্গ জুড়ে দিয়ে বলে,—আমাদের দেশের একজন চিন্তানায়ক বলে-ছিলেন:—Who never ate his bread with tears, who never sat through the sorrowful night, weeping upon his bed, does not know you, O! heavenly powers. অর্থাৎ চোখের জলে ভিজিয়ে যে কখনো রুটি খায় নি, যে কখনো দুঃখের রাত বসে কাটায়নি, বিছানায় শুয়ে কাঁদে নি, হে প্রভু, সে তোমাকে জানে না, চেনে না।

তাই বলছিলাম, দুঃখকে বরণ করে না নিলে সুখের দেখাও পাওয়া যায় না। এক হিসেবে বলতে পারো, অন্ধকার রাত যেমন আলো ঝলমলে প্রভাতকে বয়ে আনে, তেমনি দুঃখের কালো পাখায় ভর দিয়েই আসে সুখ। এই যে আজকে তোমরা সংগ্রাম করছো, এই সংগ্রামের পথপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে জয়। আর সেই জয় তোমাদের ভবিষ্যত পথের আলো দেখাবে।

গভীর আবেগে ফাদারের ফর্সা মুখাবয়ব রাঙা হয়ে উঠেছে। মেঘাই বুঝতে পারে এতগুলো মানুষের দুঃখ, সবার দুঃখকেই একটা পরম শান্তিতে মিশিয়ে দিতে আজ এই পথ বেছে নিয়েছে ফাদার। বাইবেলের সারমনগুলোতে নিজেকে স'পেছে।

মেঘাই জানে ফাদার এখন এই দুপুর রোদে এতোখানি পথ হেঁটে যাবে মেলিয়াপোঁতা। সেখানকার চাষীরা নীলকরদের হাত থেকে রেহাই পেতে নিজেদের পূর্বপুরুষের ধর্ম বিসর্জন দিয়ে খৃষ্টান হয়েছে, তবু রেহাই পায় নি। কারণ নীলকররা ধর্মের দিকে তাকায় না। চেনে শুধু টাকা মদ আর মেয়েমানুষ। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে একটা দেশের মাটি কি করে এতো বিপরীত চরিত্র মানুষের জন্ম দেয়। এক-দিকে যেমন স্কিনার, লাইটফুট্, মরেল প্রভৃতি সে দেশ থেকে এসেছে, অন্যদিকে তেমনি ফাদার বমভাইটিস্ আর কোলকাতায় শুনে আসা লঙ্ সাহেবের জন্মও সেই মাটিতে। বিচিত্র এই পৃথিবী! তার থেকেও বিচিত্র বোধহয় মানুষের মন।

ফাদার মেলিয়াপোঁতার উদ্দেশ্যে বেরোতে মেঘাইও বেরিয়ে পড়ে। ভালো জমির প্রায় সবটাই নীলকর টেগার্ট নিয়ে নিয়েছে। বাকী যা আছে তা'তে সম্বৎসরের খোরাকী উঠবে কিনা সন্দেহ। যদি ডান-বাঁ বাঁচিয়ে খরচ করলে চলে।

আসাননগরে মেঘাইদের অবস্থাই সব থেকে ভালো ছিলো। গোলাভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ আর জমি ভর্তি ফসল। অভাব তো দূরের কথা, তার চিহ্নও ওদের সংসারে ছিলো না। কিন্তু আজ নীলকরের দৌলতে জমির ফসল, পুকুরের মাছ গেছে; তবু যদি ওরা ওখানেই থেমে থাকতো।

একা মেঘাইয়ের পক্ষে এর প্রতিকার করা সম্ভব নয়। তার জন্য দলবেঁধে সবাই মিলে রুখে দাঁড়াতে হবে। মনে পড়ে ছোটবেলায় টোকা মাথায় দিয়ে ছোট মেঘাই মাঠের ধান বোনা দেখতে যেতো। সার সার মানুষগুলো মনের আনন্দে এক হাঁটু জলে নেমে ধান বুনে চলেছে। মেঘাইও মাঝে মাঝে থাকতে না পেরে নিজেও গিয়ে

ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওদের মধ্যে। ছোট হু'টো হাতে যতোটা পেরেছে সাহায্য করেছে। তারপর যখন পাকা ধানে হলুদ হয়ে মাঠটা গিয়ে দূরের দিগন্তকে ছুঁয়েছে সেই মাঠের শিয়রে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেছে মেঘাই। মনে হয়েছে, সেদিনের সেই সবুজ গাছ-গুলোর ওপর কে যেন মুঠো মুঠো সোনা ছড়িয়ে দিয়েছে। সকালের রোদ চিক্‌চিক্ করছে। হাওয়ায় মাথাভাঙার নিস্তরঙ্গ জলে ঢেউ তুলেছে। আর মেঘাই চোখ ভরে স্বপ্ন এঁকেছে সুখের, স্বাচ্ছল্যের আর খুসীর।

কিন্তু সেদিনগুলো আজ কোথায়! গ্রাম-বাংলার বুক থেকে সেই দিনগুলো আজ সবার অলক্ষ্যে কে যেন মুছে দিয়েছে।

এইসব এলোমেলো ভাবতে ভাবতে আসাননগরে ঢুকে দেখে চণ্ডীমণ্ডপে কিছু ছেলে যাত্রার মহড়া দিচ্ছে। আগের মতো সন্ধ্যের পর চণ্ডীমণ্ডপ আর জাঁকিয়ে বসে না। আর বসবেই বা কী করে? প্রতি গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপই হলো সেই গ্রামের পুরুষদের জমায়েত হওয়ার জায়গা। সারাদিন পরিশ্রম করে এখানে আসে হয় গল্প করতে, না হয় পরবর্তী যাত্রার পালার মহড়া দিতে।

মেঘাইও আসতো এখানে। আজকাল আর আসে না। ভালো লাগে না। আগের মতো জমায়েতও আর হয় না। কেনই বা হবে? সুখ-দুঃখ সবই তো এখন বাঁধা পড়েছে নীলকুঠিতে।

ইচ্ছে না থাকলেও মেঘাইকে ওদের মাঝে গিয়ে বসতে হয়। ওরাই ধরে নিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ যাত্রার পালার মহড়া দেখে মেঘাই। পৌরাণিক কোন পালা। কোণের দিকে একটা ছেলে বসে বাঁশের বাঁশী বাজাচ্ছে। অপটু হাতের সেই বাঁশীর সুর যেন হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। একদিন মেঘাই নিজেও বাঁশী বাজাতো। আসাননগরের আকাশ ছাড়িয়ে সেই সুর ভেসে যেতো মাঠের ওপর দিয়ে দূরে অন্য কোন গ্রামে। ওকে উদাসীন করে দিতো। কিন্তু আজ?

ভালো লাগে না পুরোন সেইগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করতে। উঠে পড়ে যাত্রার আসর থেকে। বাড়ীর দিকে রওনা হয়।

মেঘাই ভেবেছিলো ঝিনাইদহে যাবে। মহেশবাবু ডেকে পাঠিয়েছে। ওখানকার প্রস্তুতিপর্ব একরকম শেষ। লোক মারফৎ সব খবরই পেয়েছে মেঘাই। ইচ্ছেও ছিলো যাবার। কিন্তু কুসুমের জন্যই হয়ে ওঠে না। যাবার কথা শুনেই কুসুম এসে দাঁড়িয়েছে ওর সামনে। বলেছে,—আর ক'দিন পরেই দোল। এতো কষ্ট করে আয়োজন করলাম, তুমি না থাকলে যে সবই মাটী।

শেষপর্যন্ত মেঘাই মহেশবাবুর কাছে যাওয়া বাধ্য হয়ে স্থগিত রাখে। সত্যি তো, কতো আশা নিয়ে ও ক'দিন ধরে দাওয়ার অর্জুন গাছের নীচটা পরিষ্কার করেছে। গোবর নিকিয়েছে। মেঘাই যদি জোর করে যায় তবে মুখ ফুটে হয়তো কুসুম কিছুই বলবে না, মনে মনে কষ্ট পাবে। সেই কবে সংসারে এসে হাল ধরেছে, কতো বিপর্যয় গেছে, তবু বিরক্তি তো দূরের কথা, তার আভাস পর্যন্ত পায় নি মেঘাই হাসিমুখে সবকিছু সহ্য করে নিয়েছে। তাই ওর মনে আঘাত দিতে সংকোচ হয়। একটু ভেবে নিয়ে মেঘাই বলে,

—ঠিক আছে, তুমি যখন বলছো, তখন যাবো না।

কুসুম আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্বাস করতে পারে না। তারপরে আবার জিজ্ঞাসা করে,—সত্যি বলছো?

—হ্যাঁ গো, দোলের পরেই যাবো।

খুসীর জোয়ারে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে নি কুসুম। ওকে জড়িয়ে ধরেছে গভীর আবেগে। তারপর বলেছে—দেখো, কতো সুন্দর করে সাজাবো রাসমঞ্চ।

এর পরের ক'টা দিন দাওয়ার একধারে বসে লক্ষ্য করেছে মেঘাই কী অমানুষিক পরিশ্রম করেছে কুসুম। নিজে হাতে পরিপাটি করে সাজিয়েছে। সেই সময় কুসুমকে দেখে মনে হয় নি যে ও আর কিছুদিন পরেই মা হবে। মনে হয়েছে, সেই প্রথম দেখা চতুর্দশী কুসুম আবার যেন সেখানেই ফিরে গেছে। কখন মন মতো সাজাতে পারায় খুসীতে উজ্জ্বল, আর কোন সময় মনের মতো না হওয়ায়

অভিমানে গম্ভীর।

দোল পূর্ণিমার রাতে মেঘাই আর কুসুম এসে বসে গাছের তলায়। একটু ছেড়েই রাসমঞ্চ। কুসুম মঞ্চের ওপর মুঠো মুঠো আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি কিনে এনেছে শিবনিবাসের ভীম একাদশীর মেলা থেকে। সেই মূর্তিকে বসিয়েছে মঞ্চের ওপর। কুসুম সরে এসে বসেছে মেঘাইয়ের গা ঘেঁষে।

বাতাসে ভেসে আসছে আবীরের গন্ধ। দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে কোন গ্রামে যাত্রার আসর বসেছে। তারই বাঁশীতে পূর্বরাগের বিরহের মূর্চ্ছনা। আকাশে বিরাট বড়ো সুগোল চাঁদ উঠেছে সেই পূর্ণিমার চাঁদের হলুদ রঙের জ্যোৎস্নার রশ্মিগুলো দাওয়ার ওপরের সুপারিগাছগুলোর চিরোল চিরোল পাতার ওপর পড়ে তিরতির করে কাঁপছে। সামনের মাঠের ফসল কেটে নিয়ে গেছে। চাঁদের আলোয় ভরে গেছে মাঠটা আর কুসুমও যেন আজকের এই পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েছে। নতুন তাঁতের শাড়ী পরেছে কপালের মাঝখানে এঁকেছে বিরাট বুড়ো সিঁদুরের টিপ। পরিবেশটাই আনমনা করে দেওয়া।

আর আনমনা হয়েই মেঘাই কুসুমের পাশে বসেছিলো। স্বপ্ন দেখছিলো আগামী দিনগুলোর। একদিন নীলকরদের তাড়িয়ে দেবে। গ্রাম বাংলা আবার সবুজে সবুজ হয়ে উঠবে। পুরোন দিনগুলো ফিরে আসবে। প্রতিবছর ঘরে ঘরে নবান্ন শুরু হবে, হবে দোলযাত্রা। বারো মাসে তেরো পার্বণ।

নটবরের ডাকে সংবিত ফেরে। কুসুম লজ্জা পেয়ে ঘোমটাটা আরো বেশী নামিয়ে দিয়ে ঘরে চলে যায়।

ওর মুখে খবরটা শুনে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারে নি মেঘাই। দিকে দিকে যে আগুন জ্বলে উঠবে তা' তো জানা। কিন্তু সে যে এতো তাড়াতাড়ি তা' বুঝি কল্পনাতেও আনতে পারে নি মেঘাই।

তিতু মীরের সঙ্গে পর পর বেশ কয়েকটা বড়ো রকমের সংঘর্ষ হয়ে গেছে। তবু তিতু মীর পিছু হঠে নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত

গোবরডাঙার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং মোল্লাহাটির নীলকুঠির ম্যানেজার ডেভিসের সম্মিলিত বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণ রুখতে পারে নি। নারকেলবাড়িয়ার সংঘর্ষে প্রাণ দিয়েছে তিতু মীর। দামুর-হুদার মহেশ চাটুয্যে নিশ্চিন্দপুরের কুঠিকে নিশ্চিহ্ন করেছে।

মেঘাই জানতো চৌগাছায় নীলকরদের বিরুদ্ধে রোষ ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হচ্ছে। বিষ্ণুচরণ আর দিগম্বর বিশ্বাস দু'জনেই সংঘবদ্ধ করেছে চাষীদের। প্রথমে তারা যখন একজোট হয়ে নীল বুনতে অস্বীকার করেছিলো, কুঠির শতখানেক লাঠিয়াল সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো চৌগাছার ওপরে। গ্রামবাসীদের ধরে নিয়ে গিয়ে চোরকুঠ্‌রিতে আটক রেখেছিলো। কিন্তু এতোদিন পরে ওরা পালটা আঘাত হেনেছে। গতকাল রাত্রে ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বাঁশবেড়িয়ার বৈদ্যনাথ আর বিশ্বনাথ সর্দার।

নীলকররাও চুপ করে থাকে নি। তারাও বাঁশবেড়িয়া, ভীমপুর, খাল-বোয়ালিয়ার কুঠি থেকে লোক সংগ্রহ করেছে।

গতরাতের প্রকাশ্য সংঘর্ষে নীলকরদের বিরুদ্ধে যারা লাঠি ধরেছিলো, তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। বিশ্বনাথ সর্দার নীলকরদের হাতে ধরা পড়েছে।

।। তেরো ।।

ক'দিন আগে চণ্ডীমণ্ডপের পাশের মাঠটায় বিশ্বনাথ সর্দারের ফাঁসি হয়ে গেছে।

মেঘাই যায় নি। যেতে ইচ্ছেও করে নি। ওর মনের ক্যানভ্যাসে ঘটনাগুলো যেন পরপর ঘটে গেছে। কোলকাতার হরিশ মুখার্জী মারা গেছে ; হিন্দু পেট্রিয়টের অফিসে তালা ঝুলছে। লঙের জেল হয়েছে। দিগম্বর আর বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ডাকাতে গাড়ীর মাঠে নীলকরদের লাঠিয়ালের কাছে হেরে গিয়ে কোনরকমে প্রাণ নিয়ে

পালিয়েছে। আর কোনদিন যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে তার আশা নেই। ফাদার বমভাইটিস্ দেশান্তরী। হয়তো ভারতবর্ষেরই কোন গ্রাম বা শহরে, অথবা পৃথিবীর অন্য কোন নিভৃত কোণে হাতের বাইবেলটার পাতায় নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়েছে।

গ্রামের সুস্থ সুন্দর জীবনেও বর্ষার মাথাভাঙার মতো কূল ভাঙ্গতে সুরু করেছে। নটবর কদমতলী থেকে আর ফেরে নি। প্রতীক্ষায় থেকে থেকে ওর বৌ মেঘাইয়ের কাছে এসেছিলো। ও খোঁজখবর নিয়ে জেনেছে, নটবর কদমতলীরই একটা মেয়েমানুষের সঙ্গে উলুবেড়িয়া না নৈহাটির একটা পাটকলে চাকরী নিয়ে চলে গেছে। ওখানেই নাকি নতুন করে ঘর বাঁধবে। সেদিনের চাষী আজ পাটের গুদামে খাটছে। ছোট বৌঠানের মৃতদেহ বেশ ক'দিন পরে ভেসে উঠেছে পলদা বিলের জলে। এতোদিন ধরে যে সর্বনাশা জলরাশি হাতছানি দিচ্ছিলো, শেষ পর্যন্ত সেই সর্বনাশার কোলেই শেষ আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে ছোট বৌঠান। জমিদার বাড়ীর প্রতিটি ইট বাঁশ পড়েছে হয় নীলকুঠিতে না হয় বাইজীর পায়ের নূপুরে। চারিদিকে এক সর্বনাশা ভাঙার ঢেউ যেন এসে আছড়ে পড়েছে গ্রাম বাংলার বুকে। মুছে দিয়ে গেছে সুখশান্তি।

মেঘাইয়ের নিজের সংসারেও কম পরিবর্তন হয়নি। কুসুম মা হয়েছে। তবু মেঘাই সংসারে মন বসাতে পারে নি। এক একসময় রঘুর টলটলে চোখ দু'টো, অস্পষ্ট কাকলি ওকে সংসারের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। ভেবেছে, কি হবে এসব করে? ও কি একা পারবে এই সর্বনাশা ভাঙন রোধ করতে? তবু পারে নি আগের পথ থেকে সরে আসতে। উপরন্তু যতো বেশী ঢেউ এসে ভেঙেছে, ততো যেন ভেতরে ভেতরে প্রতিরোধের এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা মাথা উঁচু করে উঠেছে।

° ° ° °

বিশ্বনাথের যে জায়গায় ফাঁসি হয়েছে, সেই মাঠটাকে এখন লোকে ফাঁসিতলার মাঠ বলে। সেই মাঠের কাছেই মেঘাই সোহাগীকে থাকতে বলেছে। ইদানীং মেয়েটার সঙ্গে বাধ্য হয়েই মেলামেশা করতে

হয়। কারণ কুঠিতে ওর অবাধ যাতায়াত। তার ওপর নীলকুঠির দেওয়ান থেকে সুরু করে মালিক, ম্যাজিস্ট্রেট অনেকের সঙ্গেই ওর বেশ দহরম মহরম। অনেকের সঙ্গে এক বিছানাতে রাতও কাটায়। সুতরাং ওর কাছ থেকে কুঠির গোপন খবরাখবর সংগ্রহ করার সুবিধা।

কিন্তু কুসুম এটাকে সোজা মনে নিতে পারে নি। মেঘাই ওকে অনেক বুঝিয়েছে। সব বুঝেসুঝেও কুসুম সেই অবুঝের মতো জেদ ধরে আছে। নষ্ট মেয়ের থেকে নাকি নাগিনীকেও বিশ্বাস করা ভালো।

মেঘাই সেসব কথায় কান দেয় নি। মেয়েদের সব কথায় কান দিলে কি চলে? তবু সোহাগীর সঙ্গে মেলামেশায় ওর গম্ভীর মুখ, নিজেকে নিয়ে থাকা মেঘাইয়ের দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু ও কি করবে? যে সাগরের ডাক একবার শুনেছে, নদীর উজান তাকে বাঁধবে কি করে?

একদিকে যেমন কুসুমের জন্য কষ্ট হয়, অন্যদিকে তেমনি সোহাগীর জন্যও দুঃখ লাগে। হৃদয়ের গভীরে একটা ব্যথা অনুভব করে। সংসারের আরো পাঁচটা মেয়ের মতোই সোহাগীও স্বপ্ন দেখেছিলো—বিয়ে করবে, রাঙা সিঁদুরে সীমন্ত রাঙাবে, তারপর কারোর হাত ধরে সুন্দর একটা সংসার গড়বে। কিন্তু পারে নি। বাবার কাজ আর ছোট ভাইবোনদের মুখে অন্ন জোগাতে বাধ্য হয়ে সন্ধ্যের ঝোঁকে চোখের কোণে কাজল টানে, রঙীন শাড়ী পরে। যৌবনকে যতটা সম্ভব উদ্ধত করে নীলকুঠির সাহেবগুলো যা যায় তাই দিতে হয়েছে।

মেয়ে হয়েও কুসুম এগুলো বুঝতে চায়নি। বোঝাতে পারে নি মেঘাই ওকে সোহাগীর অন্তরের যন্ত্রণাটা। একসময় বিরক্ত হয়েই সরে এসেছে। ঘরোয়া মেয়ে কুসুম। নিশ্চিন্ত ঘরের কোণটাই শুধু দেখেছে।

রঘু দাওয়ার একপাশে খেলা করছে। রোজ বিকেলে কুসুম ওর হাত-পা ধুইয়ে বেনিয়ান পরিয়ে কাজল টেনে কামিনীর কাছে দেয়।

এদিক ওদিক বেড়িয়ে আনার জন্য। আজকে ছেলেটা দুপুরের পর থেকেই দাওয়ায় খেলা করছে। কুসুম লক্ষ্যও করে নি।

মেঘাই ঘরে ঢুকে কামিজ পরতে গিয়ে দেখে দরজায় কুসুম দাঁড়িয়ে। কামিজটা হাতে নিয়ে মেঘাই জিজ্ঞাসা করে,—আমায় কিছু বলবে?

ওর জিজ্ঞাসায় কুসুম কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে,—কি লাভ? বললেও তো শুনবে না।

মেঘাই উত্তর দেয় না। দাওয়ায় ক্রীড়ারত রঘুর দিকে তাকায়। আপন মনে রঘু খেলায় ব্যস্ত। ইতিমধ্যে দরজা ছেড়ে দিয়ে কুসুম সরে গেছে। হয়তো বা রান্নাঘরে।

ফাঁসিতলার মাঠের নির্দিষ্ট একটা গাছের নীচে এসে দাঁড়ায় মেঘাই। সোহাগী এখনো আসেনি। হয়তো বা কোন কাজে আটকা পড়ে গেছে। নয়তো গত উদ্দাম রাতটা নীলকুঠিতে কাটিয়ে আজ এখনো তার রেশ কাটেনি।

স্থানীয় জমিদার মাসিক বন্দোবস্তে পুরো জমিদারীটাই কুঠির হাতে তুলে দিয়েছে।

গত রাত্রে সেই উপলক্ষ্যেই একটা পার্টি দিয়েছে কুঠিতে। আশে পাশের কুঠির সাহেবরা ছাড়াও কেষ্টনগরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সেই পার্টিতে ছিলো। রাতভর চলেছে নাচ-গান আর মদের বন্যা। সোহাগীকেও উপস্থিত থাকতে হয়েছে ওদের চাহিদা মেটাতে। সুতরাং মদের ঝোঁকে ওরা যখন বেহুঁস হয়ে পড়েছে, ওদের কথাবার্তা তখন নিশ্চয়ই শুনেছে সোহাগী। আট-ঘাট বেঁধেই এগোন ভালো। নইলে বিষ্ণুচরণ আর দিগম্বর বিশ্বাসের মতো লোকক্ষয়ই হবে, কাজের কাজ কিছু হবে না।

মেঘাই দৃষ্টিটা তোলে। না, সোহাগী নয়। অবশ্য ও মনের অস্থিরতায় যতো তাড়াতাড়ি চলে এসেছে, সোহাগীর পক্ষে মেয়ে হয়ে

তা' সম্ভব নয়।

পশ্চিম দিগন্তে অস্তোন্মুখ সূর্য। তার শেষ সোনালী ঝলক্ এসে পড়েছে মাঠের ওপর। মনে হয়, কে যেন একটা তুলির মাথায় লাল রঙ মাখিয়ে সবুজ ঘাসের ডগাগুলোকে রাঙিয়ে দিয়েছে। ক্লান্ত পাখায় অলস শব্দ তুলে ঘরমুখো পাখীর দল নীড়ের দিকে ফিরে চলেছে। দিনের আলোর ঘোমটা খুলে দিগ্‌বধূ অন্ধকারের চেলিতে মুখ ঢাকবার তোড়জোড় শুরু করেছে।

সোহাগী আসছে। মেঘাই উঠে দাঁড়ায়। প্রতিদিনের চেয়ে ওর সাজগোজ আজ একটু অন্য রকমের। একটু বোধহয় বেশীই কাজল এঁকেছে। পরণে গাঢ় রঙের শাড়ী। সোহাগী এসে মেঘাইয়ের পাশে বসে। মেঘাই একটু সরে বসে। ওকে সরে বসতে দেখে সোহাগী মৃদু হেসে বলে, সরে বসলে কেন?

ওর দৃষ্টির ওপর চোখ রেখে মেঘাই বলে,– এমনি।

কাঁধের ওপর থেকে প্রায় খসে পড়া আঁচলটা তুলতে তুলতে সোহাগী বলে,—আমি ভাবলাম ঘরে বউ রেখে এসেছো বলে।

ওর কথায় মেঘাই হেসে ওঠে। বলে,—কেন? ঘরে বউ রয়েছে বলে বুঝি তোমার কাছে আসতে নেই?

একরাশ হাসিতে ফেটে পড়ে কাঁচভাঙা গলায় সোহাগী বলে,—বারে, আমি বুঝি তাই বলেছি?

এবার মেঘাই একটু গম্ভীর হয়। যে সম্পর্কের জন্য আসান নগরের উঠ্‌তি বয়সের ছেলেরা সেহাগীর সঙ্গ চায়, মেঘাই সে উদ্দেশ্যে সোহাগীর সঙ্গ কামনা করে না। ওর প্রয়োজন যতোটুকু তার বেশী একটা মুহূর্তও যেন অসহ্য। চোখের সামনে ভেসে ওঠে কুসুমের মুখ। কিছুটা কান্নার আভাস, কিছুটা মিনতি আর অভিমানে মেশানো। অনেক আশা এবং তার চেয়েও বেশী আকাংখা আর বিশ্বাস। আর রঘু? টলটলে দু'টো চোখ আর অসহায় একটা মুখ।

একে একে মেঘাই ওকে জিজ্ঞাসা করে গতকাল রাতে কে কে এসেছিল কুঠিতে। কি কথাবার্তা হলো, নীলকরদের পরবর্তী পরিকল্পনা ইত্যাদি। কথা বলার ফাঁকে সোহাগী সরে এসে ওর একেবারে

গা ঘেঁষে বসেছে। হাতে ওর হাতের স্পর্শ পায় মেঘাই। সোহাগী চুপ করে আছে। এক সময় ডাকে,—মেঘাই।

মেঘাই উত্তর দেয়,—আমাকে কিছু বলবে সোহাগী ?

—বলছিলাম, আমার এ জীবন আর ভালো লাগে না। চলো কোনখানে চলে যাই। শ্রীরামপুর, উলুবেড়িয়া যেখানে হোক্। তুমি চটকলে কাজ করবে আর আমি সাজাবো সংসার। সুন্দর একটা জীবন গড়ে তুলবো।

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সোহাগী। মেঘাই উঠে দাঁড়ায়। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে,—সোহাগী, চণ্ডীমণ্ডপে আজ জমায়েত হবে। আমার না গেলেই নয়।

পাতলা একটা অন্ধকারের চাদর ধীরে ধীরে মাঠের ওপর নেমে আসছে। অস্পষ্ট কুয়াশাগুলো দিগন্তকে ঘিরে রয়েছে।

সোহাগী এগিয়ে যাচ্ছে। আসাননগরের দিকে। হাল্কা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে।

মেঘাই তাকিয়ে থাকে। একটু পরেই সোহাগী মাঠ ছেড়ে রাস্তায় ওঠে।

মেঘাইয়ের কষ্ট লাগে। মেয়েটা সত্যিই হতভাগিনী। সংসারের মুখে অন্ন তুলে দিতে বাধ্য হয়েই ওকে কুঠিতে যেতে হয়। তুলে দিতে হয় সাহেবগুলোর হাতে নিজের সম্ভাবনাময় যৌবনটাকে! কিন্তু এই জীবনের পংকিলতায় বসেও স্বপ্ন দেখছে আরো পাঁচটা মেয়ের মতো স্বাভাবিক সুন্দর একটা সংসারের।

মেঘাই পর্যন্ত ওর সঙ্গে নিদারুণ অভিনয় করে চলেছে। উপায়ই বা কী ? সুন্দর একটা সংসারের লোভ দেখিয়ে ওকে দিয়ে কুঠির সমস্ত সংবাদ জোগাড় করেছে। কিন্তু সোহাগী মনে মনে বিশ্বাস করেছে যে মেঘাই ওকে নিয়ে সংসার গড়বে। হয়তো বা প্রতি মেয়ের মতোই স্বপ্ন দেখছে, কোলভরা ছেলেমেয়ে আর সুখী স্বামীর। কিন্তু এ যে কতো বড়ো মিথ্যে ওর চেয়ে তো বেশী কেউ জানে না। যখন এই সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে, তখন তো আর দশটা পুরুষের সঙ্গে ওকেও একই চোখে দেখবে। হয়তো কুঠির সাহেবগুলোর চেয়েও ওকে নীচে

ঠাঁই দেবে। তাদের কাছে তবু তো পেটের খোরাক জোটে। আর ওর কাছ থেকে যে পাবে শুধুই ছলনা।

চণ্ডীমণ্ডপে না গিয়ে মেঘাই গণপতির বাড়ীতে আসে। ওকে যশোর পাঠিয়েছিলো। ওখান থেকে কিছু লাঠিয়াল জোগাড় করতে। ওর বাড়ীতে এসে খোঁজ পায় গণপতি এখনো ফেরে নি।

বাড়ীতে ফিরে দেখে কুসুম বসে আছে। রঘু ঘুমিয়ে। সাধারণত সন্ধ্যেবেলায় রঘুকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে কুসুম নিজেও ঘুমিয়ে পড়ে। ওকে ঘুম থেকে ডেকে তুলতে হয়। কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম। ঘরে ঢুকে মেঘাই নীচু স্বরে ডাকে,—কুসুম!

কুসুম উত্তর দেয় না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মেঘাই আবার ডাকে,—কুসুম!

এবার আর কুসুম চুপ করে থাকতে পারে না। বলে,—আমায় কিছু বলছো?

—রঘু ঘুমিয়ে পড়েছে?

ওর সেই প্রশ্নে উত্তর না দিয়ে কুসুম সরে আসে। ঘরের কোণে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। সেই আলোতে ঘরের সব অন্ধকার দূর হয় নি। আলো আঁধারির মিশালীতে কুসুমকে অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। জানলাটার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার। সেই অন্ধকারের দিকে স্থির অচঞ্চল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কুসুম। কয়েক মুঠো আলো এসে পড়েছে ওর মুখের একটা পাশে, চুলে।

একটু এগিয়ে এসে মেঘাই বলে,—কুসুম, তুমি আমার ভুল বুঝেছো। এতোদিন ধরে একসঙ্গে সংসার করলাম, পাশাপাশি জীবনের এতোটা পথ হাঁটলাম, আর—।

বাকীটা আর ওকে বলতে দেয় না কুসুম। ঘুরে দাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর বুকে। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ে বলে,—নাগো, আমি তোমায় ভুল বুঝি নি। জানি, সোহাগীর কাছে যাও কুঠির গোপন খবরের জন্য। অন্য কোন প্রয়োজনে নয়। তবু রঘুর কথা ভেবে মন যে মানে না।

মেঘাই ধীরে ধীরে ওর চোখের জল মুছিয়ে দেয়। বলে,—তা'

আমি জানি কুসুম। তবে আমার প্রয়োজনও শেষ হয়ে গেছে সুতরাং সোহাগীর কাছে আর যাবো না।

ওর কথা শেষ হলে কুসুম দৃষ্টি তোলে। শাড়ীর আঁচলে চোখ মোছে। তারপর বলে,—চলো, খেতে চলো।

° ° ° °

রঘু অঘোর ঘুমে অচেতন। সারাদিন দুষ্টুমির পর পরিশ্রান্ত হয়ে হয়ে বিছানায় শুয়েই চোখের পাতা খুলে রাখতে পারে না। কুসুমও ঘুমোচ্ছে। পর পর ক'টা দিন সোহাগীর জন্য ওর সঙ্গে ভালো করে কথা বলে নি। অস্বস্তি আর যন্ত্রণায় কেটেছে দিনগুলো। সন্ধ্যের পর সে অভিমান ওর কেটে গেছে তাই ওকে জড়িয়ে ধরে পরম পরিতৃপ্তিতে ঘুমিয়ে আছে। মেঘাই অনুভব করে ওর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের প্রতিটি শব্দ। ধীরে ধীরে জড়িয়ে ধরে থাকা কুসুমের হাতটা খুলে পাশে রাখে। নিরীক্ষণ করে ওর ঘুমন্ত মুখ ; সরল গভীর বিশ্বাসে পরিপূর্ণ। সংসারের খুঁটিনাটি কাজে সারাটা দিন কাটানোর পর পরিশ্রান্ত কুসুম মেঘাইয়ের বুকের উত্তাপে ঘুমিয়ে রয়েছে।

ওর পাশ থেকে উঠে মেঘাই দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়। নিস্তব্ধ নিরালা আসাননগর। গাছের থেকে খসে পড়া পাতার শব্দও বুঝি শোনা যায়। কুকুরগুলো একযোগে চিৎকার করে চলেছে।

আকাশে একফালি চাঁদ দেরী করে উঠেছে। একরাশ ফুটফুটে নক্ষত্রের উজ্বল চোখ যেন ঝিকমিক করছে। সেই নক্ষত্রগুলোর চোখ থেকে ঝরে-পড়া আলো দিগন্তের কুয়াশার সঙ্গে মিশে কেমন অদ্ভুত, রহস্যময় দেখাচ্ছে। আলো-কুয়াশায় মেশামেশি সামনের পৃথিবীটা যেন পেছনে ফেলে আসা জানা অতীত আর আগামী দিনের অজানা ভবিষ্যতের প্রতীক। ঘরের ভেতরে যে দু'জন ঘুমিয়ে রয়েছে, তাদের ভবিষ্যতও মেঘাইয়ের সঙ্গেই জড়িত। সব জেনেও মেঘাইয়ের করবার কিছু নেই। যে পথ ও বেছে নিয়েছে সে পথ ধরেই ওকে এগিয়ে যেতে হবে। অজানা এই পথ। তার চেয়েও অজনো ভবিষ্যত। তবু

ফিরবেই বা কী করে? এতোগুলো মানুষের ভাগ্যের কাছে স্ত্রী-পুত্রের ভাগ্যই কী বেশী? নানারকম প্রশ্নে মেঘাইয়ের মনটা অশান্ত হয়ে ওঠে।

মাঝে মাত্র আজকের রাতটুকু আর কালকের দিনটা বাকী। তারপরে মেঘাই জানেনা ওর ভাগ্যে কি আছে। ওদের ভাগ্যই বা কোন্ পথে মুখ ঘোরাবে।

সোহাগীর কথা অনুসারে এই সুযোগ। কুঠির অধিকাংশ লাঠিয়াল আর সড়কিওয়ালা বেতিয়াতে গেছে। ওখানে নাকি গোলমাল লাগার সম্ভাবনা। সুতরাং বলতে গেলে কুঠি প্রায় ফাঁকা। একবার ওদের ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে পলদার বিলে ভাসিয়ে দিতে পারলে আর কখনই উজানে ফিরে আসতে পারবে না।

মনের ভেতরে এক অদ্ভুত উত্তেজনা অনুভব করে মেঘাই। রক্তে রক্তে জেগে ওঠে দুর্ব্বার এক নেশা। সে নেশার কাছে মুছে যায় কুসুমের বিশ্বাসে পরিপূর্ণ মুখ। রঘুর অসহায়তা। সব ছাপিয়ে ভেসে ওঠে এতোগুলো মানুষের মুখবুজে সবকিছু সহ্য করে নেবার বিষণ্ণতা, দুঃখে ভরা মুখ-মিছিলের সারি।

॥ চোদ্দ ॥

গণপতি এলে ওকে ডেকে মেঘাই ঘরের ভেতরে নিয়ে বসায়। একে একে জিজ্ঞাসা করে গ্রামের খবরাখবর। মোল্লাহাটির লাঠিয়ালের দল দুপুরের কিছু পরেই এসে পড়বে। যশোর থেকে সড়কিওয়ালারা এসে গেছে। শুধু আসান নগরেই নয়। আশেপাশের গ্রামের বাড়ীগুলোতেও তারা নিজেদের মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েছে। অতিথি হিসেবে প্রতি বাড়ীতে দু'একজন করে রয়েছে। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও মেঘাই নিজের বাড়ীতে কাউকে রাখে নি। ওর ওপর কুঠি তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। তাই বলা যায় না কখন কি হয়।

কখন কোথায় সবাই জড়ো হবে সে সম্পর্কে আগে থেকে ঠিক করা থাকলেও আজ সড়কিওয়ালা, লাঠিয়ালদের দলপতিকে সে সম্পর্কে অবহিত করে দিতে হবে ! চণ্ডীমণ্ডপে সে কাজ করা সম্ভবপর নয়। গ্রামের মানুষদের ভেতরেও তো শত্রুর অভাব নেই। আর এসব কাজ যতোখানি সম্ভব গোপনীয়তা রেখে নিরালা নিভৃতেই করতে হয়।

গণপতিকে ভীমপুরের বেচু প্রামানিকের বাড়িতে ওদের নিয়ে জমা হতে বলে মেঘাই ঘরে ঢোকে। মুখ-হাত ধুয়ে চা খেয়ে জামা কাপড় পরে বেরোবার সময় কুসুম বলে—এখন আবার কোথায় চললে ?

একটু সময় চিন্তা করে নিয়ে মেঘাই বলে—আমি যাবো ভীমপুরে। একটু কাজ আছে। তাড়াতাড়িই ফিরে আসবো।

সমস্ত গ্রামটাই যেন থমথম করছে। হ'তে পারে মেঘাইয়ের ভেতরের উত্তেজনাটার জন্যেই এই রকম লাগছে।

আনমনে ভীমপুরের রাস্তা ধরে হেঁটে যেতে যেতে অনেক চিন্তাই মনের মাঝে জেগে ওঠে। যদি এই কুঠি আক্রমণে হেরে যায় তবে এই আসাননগরের বসবাসও তুলে দিতে হবে। কারণ নীলকররা এর প্রতিশোধ পুরোপুরিই নেবে। যা নিয়েছে চৌগাছা অথবা দামুর হুদায়। আর যদি জেতে তবে আগামী ভবিষ্যতে টেগার্ট তো দূরের কথা, কোনো নীলকরই আর সাহস পাবে না কুঠি গড়তে। বুকের ভেতরের প্রতিটি রক্ত কণিকায় আগুন জ্বলে। দেহের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুতে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা মাথা উঁচু করে ওঠে। ইচ্ছে যায় চাষীদের রক্তে গড়া কুঠির প্রত্যেকটি ইট পলদার বিলের অতল জলে তলিয়ে দিতে।

ভীমপুরের বেচু প্রামাণিকের বাড়ীতে গণপতি আগেই এসে উপস্থিত হয়েছে। মেঘাই যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্ত জিনিসটা ওদের বুঝিয়ে দেয়। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কোনদিকে আক্রমণ করবে প্রভৃতি পরিকল্পনা স্থির করে।

প্রথম সন্ধ্যার অন্ধকারে ওরা সবাই জমায়েত হবে চণ্ডীমণ্ডপে

ফাঁসিতলার মাঠে। বিশ্বনাথ সর্দারের ফাঁসি হয়ে চৌগাছার বিদ্রোহের যেখানে শেষ হয়ে গেছে, মেঘাইদের যাত্রা সেখান থেকেই সুরু হবে।

ওদের সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে মেঘাই আসাননগরের পথ ধরে। একবার ভেবেছিলো রঘুকে সঙ্গে দিয়ে কুসুমকে কেষ্টগঞ্জে পাঠিয়ে দেবে। পরে অবশ্য সে মত বদল করেছে ; কারণ কুসুমকে সরালে গাঁয়ের সমস্ত বৌ-ঝিদেরই বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু তা'হলে নীলকররা হয়তো সন্দেহ করে আগে-ভাগেই সাবধান হয়ে যাবে। সুতরাং ইচ্ছে করেই মেঘাই সে চিন্তা ত্যাগ করেছে।

বাড়ি ফিরে দেখে রঘু আঙিনায় খেলায় মত্ত, ওকে কাছে ডেকে মেঘাই কোলে তুলে নেয়। আদর করে, কতো রাত এই ছেলেটার স্বপ্নেই ও আর কুসুম জেগে কাটিয়েছে। পরস্পর ঝগড়া করেছে। আর আজ? এতোটুকু আদর করার মতো সময়ও করে উঠতে পারে না।

ওকে কোলে করেই রান্নাঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। রান্না করতে করতে কুসুম বাপ-ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসে। মেঘাইয়ের মনে হয়, এ যেন মাতৃত্বের গর্বে গর্বিতা মায়ের হাসি। সুখের সংসার গড়ে তুলতে পারার সার্থকতায় উজ্জ্বল।

—ছেলে কোলে করে এতো আদর যে হঠাৎ?

মেঘাইও অভিমান স্বরে উত্তর দেয়—কেন করতে নেই বুঝি?

—বারে, আমি বুঝি তাই বললাম। আচ্ছা লোক তো তুমি?

দুপুরের খাওয়ার পর শুয়ে মেঘাই কুসুমকে ডাকে, কুসুম ওর শিয়রে বসে মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করে—কি ব্যাপার বলোত? আজ তোমাকে খুব উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে?

—না, ব্যাপার আর কী? এমনি।

—ওভাবে ঢেকে রাখলে চলবে না। আমাকে সব খুলে তোমাকে বলতেই হবে।

একবার ভেবেছিলো মেঘাই ওকে কিছু বলবে না। মেয়েমানুষ

পেটে কথা রাখতে পারবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু পরমুহূর্তে মনে হয় ওর কাছে কোন কিছু লুকানোটা উচিত হবে না। মেঘাই ধীরে ধীরে ডাকে— কুসুম!

ডাকটা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসে।

—কুসুম, জানো আজ রাতে শুনেছি কুঠির লাঠিয়াল আসান নগর আক্রমণ করবে। যারা সমস্ত জমি নীল চাষ করতে রাজী হবে না, তাদের জোর করে ধরে নিয়ে চোরকুঠ্রিতে আটকে রাখবে।

কথাগুলো শুনে কুসুমের মুখটা মুহূর্তে যেন সাদা হয়ে যায়। কে যেন সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে—তবে?

—তবে আর কি? আমরাও প্রস্তুত। এতো সহজে জমি আমরাও ছেড়ে দেবো না।

মেঘাই তাকিয়ে দেখে কথাগুলো শুনে কুসুম পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গেছে। চুপ করে কি যেন ভাবছে।

০ ০ ০ ০

সন্ধ্যের ঘোর সবেমাত্র লেগেছে। খবর আগে থেকে সবাইকে দেওয়া। রাতের অন্ধকার ঘন হলে পরে ফাঁসিতলার মাঠে এসে সবাই জমায়েত হবে।

বাড়ী থেকে বের হওয়ার আগে মেঘাই কুসুমকে ডাকে। কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। তারপর আবেগে বুকে টেনে নেয়। কুসুম কান্না পেলেও কাঁদে না। তা'তে মেঘাইয়ের অমঙ্গল হবার আশংকাই বেশী। কুসুমকে বুকে নিয়ে আবেগজড়িত গলায় মেঘাই বলে,—কুসুম, রঘু রইলো। আর কথা কথা বলতে পারে না। আবেগে গলাটা বুজে আসে। রঘুকে আদর করে বেরিয়ে পড়ে মেঘাই।

ফাঁসিতলার মাঠে হাজির হয়ে দেখে প্রায় সবাই এসে জড়ো হয়েছে। অন্ধকার ফাঁসিতলার মাঠটা থমথম করছে। যশোরের

সড়কিওয়ালারা তৈরী।

মেঘাই সমস্ত পরিকল্পনা সবাইকে বুঝিয়ে দেয়। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আক্রমণ করবে। সড়কিওয়ালাদের ওপরেই প্রধান আক্রমণের ভার। তবে নীলকুঠির মেয়েছেলে বা শিশুদের গায়ে হাত তোলা কোনরকমেই চলবে না। বর্তমানে বন্দী করে নিয়ে সুবিধা মতো কেষ্টনগরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আর নীলকুঠি দখল হইলে ভেতরের জমা সম্পদ বাইরের থেকে যারা যারা এই যুদ্ধে অংশ নিতে এসেছে, তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে। আসান নগরের কারোর কোন অধিকার নেই তা'তে। মেঘাইয়ের এই প্রস্তাবে সবই সম্মতি দেয়।

অন্ধকার রাত। দশহাত দূরের জিনিষও নজরে আসে না। কুসুম আর রঘুর কথা মনে পড়ে মেঘাইয়ের। মুহূর্তের জন্য তারপরেই সবকিছু ঝেড়ে ফেলে দেয় মেঘাই মন থেকে। এ সময়ে এসব চিন্তা ওকে দুর্বল করে দেবে মাত্র।

পুবদিক থেকেই আক্রমণটা জোরদার করতে হবে। সুতরাং সড়কিওয়ালাদের সংখ্যা ওদিকেই বেশী রাখা দরকার। ওদের নির্দেশ দেবে গণপতি। গণপতি নিজেও ভালো সড়কি চালাতে পারে। গণশা উত্তরদিক। পশ্চিমে পলদা বিল, সুতরাং পালাবার পথ বন্ধ। আর দক্ষিণদিকের নেতৃত্বের ভার ভীমপুরের ভল্লাওয়ালা রহিম শেখের ওপর। মেঘাই সবদিকে নজর রাখবে। প্রয়োজন মতো যেখানে সাহায্যের প্রয়োজন।

আদিম অন্ধকারে সরীসৃপের মতো ওরা এগিয়ে চলে। বুকে অদম্য সাহস আর প্রতিহিংসা দাউ দাউ করে জ্বলছে।

গণপতির দল সবচেয়ে আগে এগিয়ে চলে। কুঠির কাছে গিয়ে মশাল জ্বালে। ঝাঁপিয়ে পড়ে কুঠির ওপর। মেঘাই চরকির মতো চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। শুধু কুঠি দখল করলেই হবে না।

কুঠিটা কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্বলতে আরম্ভ করেছে। রাতের আসান নগরের আকাশ সেই আগুনে রক্তরঙা। এতোদিনের স্বপ্ন সফল

হয়েছে। আর একটু পরেই কুঠিটা মাটিতে মিশে যাবে। চারিদিকের উল্লাস কানে আসে। মেঘাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়। তারপরেই উত্তরদিকে ছোটে। পেছন থেকে হঠাৎ এসে গোরা সৈন্যের দল বন্দুক নিয়ে ঘিরে ফেলেছে গণপতিকে। গণপতির বেরোবার পথ বন্ধ। সড়কিওয়ালারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। গণপতিকে বেরোবার পথ করে দিতে মেঘাই গোরা সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করে গণপতির পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। গণপতিকে পালিয়ে যেতে বলে। কিন্তু গণপতিকে আড়াল করতেই একটা গুলি এসে লাগে মেঘাইয়ের বুকে। রক্তের স্রোতে আসান-নগরের মাটি ততোক্ষণে ভিজে গেছে। কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর সব অন্ধকার।

রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। সকাল হয়নি। পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার তখনো লেগে রয়েছে আকাশের গায়ে, মাঠের ওপরে, আসান নগরের প্রতিটি মানুষের মনে।

শেষ রাতেই খবরটা পেয়েছিলো কুসুম। খবরটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে কান্নাতে ভেঙে পড়েছে। কিন্তু একটু পরেই নিজেকে সামলে নিয়েছে। চোখের সামনে দেখেছে রঘু দাঁড়িয়ে। ওকে দেখে চেতনা ফিরে এসেছে কুসুমের। এখন ভেঙ্গে পড়লে চলবেনা। ওকে দাঁড়াতে হবে। শক্ত হতে হ'বে। রঘুনাথ বড়ো হবে। স্বামীর আদর্শে ওকে গড়ে তুলবে কুসুম।

সকাল বেলাতে কোম্পানীর সৈন্যরা নিশ্চয়ই আসাননগরের প্রতিটি বাড়িতে অত্যাচার শুরু করবে। কুসুমকে রেহাই দেওয়া দূরে থাক, মা-ছেলে দুজনকে নিয়ে কুঠিতে আটক করবে। তাই ভোর হবার আগেই ওকে আসাননগর ছেড়ে চলে যেতে হবে। যে সংসার আজ ভেঙ্গে গেলো, সেই ..ংসারকে আবার তিল তিল করে গড়ে তুলতে হবে। ছেলের মাঝেই খুঁজে পেতে হবে স্বামীকে। ওকে নিয়েই স্বামীর আরব্ধ কাজ শেষ করতে হবে।

সবকিছু পেছনে ফেলে রেখে দিয়ে কুসুম রঘুর হাত ধরে এসে গরুর গাড়িতে ওঠে। গাড়িটা ধীরে ধীরে আসাননগরের পথ বেয়ে কেষ্ট-গঞ্জের দিকে এগিয়ে চলে। প্রথম রাতের উত্তেজনার পর শেষরাত নিষ্ঠুর নীরবতায় স্তব্ধ। কে যেন একটা নির্জনতার চাদরে সমস্ত গ্রামটাকে ঢেকে দিয়েছে। এই পথ দিয়েই কুসুম একদিন চেলিতে ঘোমটা দিয়ে পাল্‌কি করে মেঘাইয়ের মুখোমুখি বসে গ্রামে ঢুকেছিলো।

ধীরে ধীরে আসাননগর সরে যাচ্ছে। পলদার বিলের ওপারে কুষ্টিয়া-মেহেরপুরের আকাশে সূর্য উঁকি দিয়েছে। সমস্ত রাতের কালিমা মুছে গিয়ে আকাশ-দেওয়ালটা সিঁদুর রঙের রোদে ভরে গেছে। কুসুম একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে।

—